KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 7/1 7/2 7/5 7/6	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ভাদ্র ১৩২৭ আশ্বিন ১৩২৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

রামমোহন রায়।*

আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে আপনাদের সুমুখে উপস্থিত হয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে বহুদিন ধরে অনুরোধ করে আসছেন। কতকটা অবসরের অভাবের দরুণ কতকটা আলস্যবশত সে অনুরোধ আমি এতদিন রক্ষা করতে পারি নি। তিনি যে বিষয়ে আমাকে বলতে অনুরোধ করেন, সে বিষয়ে ভাল করে কিছু বলবার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া দরকার, এবং তার জন্য কতকটা অবসরও চাই, কতকটা পরিশ্রমও চাই।—রামমোহন রায় সম্বন্ধে যেমন তেমন করে যা-হোক একটা প্রবন্ধ গড়ে তুলতে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়। যে ব্যক্তিকে আমি এ যুগের একমাত্র মহাপুরুষ বলে মনে করি, তাঁকে মৎফরাক্কা রকম একটা সার্টিফিকেট দিতে উদ্যত হওয়াটা আমার মতে ধৃষ্টতার চরম সীমা।

শেষটা আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় যখন আমাকে কথোপ-কথনচ্ছলে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি দিলেন তখন আমি তাঁর উপরোধ এড়িয়ে যাবার কোনও পথ দেখতে পেলুম না।

কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকা এ যুগের বাঙলাদেশের সব 'ইতে বড় লোক কে, পাঠকদের কাছথেকে এই প্রশ্নের জবাব

* কোন একটি সাহিত্যসভায় পড়া হবে বলে' লিখিত।—

চেয়েছিল। পাঠকদের ভোটে স্থির হয়ে গেল যে, সে ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। দেশের লোক যে এ সত্য আবিষ্কার করেছে এ দেখে আমি মহা খুসি হলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে একটি প্রশ্নও জেগে উঠল। রামমোহন রায় যে বাঙলার, শুধু বাঙলার নয়, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ এ সত্য বাঙালী কি উপায়ে আবিষ্কার করলে?—রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় আছে এমন লোক আমার পরিচিত লোকের মধ্যে একান্ত বিরল, অথচ এঁদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন যথোচিত সুশিক্ষিত এবং দস্তুরমত স্বদেশভক্ত। লোকসমাজে অনেকেরই বিশ্বাস যে রামমোহন রায় বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাঙলার সর্ব্ব-প্রথম গদ্য-লেখক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে এই যে, তিনি হচ্ছেন বাঙলা-গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক। অথচ তাঁর লেখার সঙ্গে বাঙলা লেখকদেরও পরিচয় এত কম যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা লিখতেও কুণ্ঠিত হন না যে, রামমোহন রায় ইংরাজি-গদ্যের অনুকরণে বাঙলা-গদ্য রচনা করেছিলেন। এর পর যদি কেউ বলেন যে, শঙ্করের গদ্য হার্বার্ট স্পেনসারের অনুকরণে রচিত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু আপনাদের একটি খবর দেই, যা শুনে আপনারা শুধু আশ্চর্য্য নয়, অবাক হয়ে যাবেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন ধরে নানা উপায়ে একদল research-scholar তৈরি করবার চেষ্টায় আছেন, কাউকে scholarship দিয়ে, কাউকে ডাক্তার উপাধি দিয়ে, আর কাউকে বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দিয়ে। এঁদের হাতে যে

সকল গবেষণাপূর্ণ পুস্তক তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে দুচারখানা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একখানি হচ্ছে—

History
of
Bengalee Literature
In The Nineteenth Century.
1800—125
By
Sushil Kumar De, M.A.
Premchand Roychand-Research Student, Post-Graduate Lecturer, Calcutta University, and Hony. Librarian Bangiya Shahitya Parishat.

বঙ্গভাষার এই ইতিহাসখানি পুস্তিকা নয়, অক্টেভো সাইজের ৫১০ পাতার পুস্তক। এ পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নি। যদি কোথায়ও করা হয়ে থাকে ত, সে নাম সাধারণ পাঠকের চোখে সহজে পড়ে না—তা আবিষ্কার (research) সাপেক্ষ। এ উপেক্ষার কারণ কি? ঐতিহাসিক মহাশয়ের মতে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের নাম যে উল্লেখযোগ্য নয়, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, কেননা তিনি গণ্ডা গণ্ডা পণ্ডিত মুনসি মিসনারি এবং কবিওয়ালাদের বিষয় গণ্ডা গণ্ডা পাতা লিখেছেন। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতে রামমোহনের গ্রন্থ নেই এবং সে-মহাশয় research করেও তার সাক্ষাৎ পান নি।

রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে পরিচয় নেই এর চাইতে তার কি আর বেশি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হতে পারে!

(২)

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রামমোহন রায় এই অল্প কালের মধ্যেই ইতিহাসের বহির্ভূত হয়ে কিম্বদন্তির অন্তর্ভূত হয়ে পড়লেন কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, সাধারণত লোকের মনে এই রকম একটা ধারণা আছে যে, রামমোহন রায় বাঙালী জাতির একজন মহাপুরুষ নন, কিন্তু বাঙলার একটি নব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মহাজন।

এ ভুল ধারণার জন্য দোষী কে? ব্রাহ্ম-সমাজ না হিন্দু-সমাজ? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের সভায় দিতে আমি প্রস্তুত নই, কেননা তাহলেই নানারূপ মতভেদের পরিচয় পাওয়া যাবে, নানারূপ তর্ক উঠবে এবং সে তর্ক শেষটা বাক্-বিতণ্ডায় পরিণত হবে। ইংরাজদের ভদ্রসমাজে ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের আলোচনা নিষিদ্ধ, কেননা বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বলে প্রমাণ হয়েছে যে, এই দুই বিষয়ের আলোচনায় লোকে সচরাচর ধৈর্য্যের চাইতে বীর্য্য বেশির ভাগ প্রকাশ করে। ফলে বন্ধু-বিচ্ছেদ, জ্ঞাতি-বিরোধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে, এক কথায় হাত হাত সমাজের শান্তি ভঙ্গ হয়। এক্ষেত্রে আমি রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হই, তাহলে তাঁর সমসাময়িক সেই পুরোণো কলহের আবার সৃষ্টি করব। একশ' বৎসর আগে রামমোহন রায়কে তাঁর বিপক্ষ দলের কাছ থেকে যে সকল যুক্তি তর্ক শুনতে হত আজকের দিনে আমাদেরও সেই সব

যুক্তিতর্ক শুনতে হবে। রামমোহন রায়ের রচিত "পথ্য প্রদান" প্রভৃতি পড়ে দেখবেন, সে যুগের "ধর্ম্ম-সংস্থাপনকারীরা" যে ভাবে যে ভাষায় তাঁর মতের প্রতিবাদ করেছিলেন, এ যুগেও সেই ভাব সেই ভাষায় নিত্য প্রকাশ পায়। এই একশ' বৎসরের ভিতর মনোরাজ্যে আমরা বড় বেশি দূর এগোই নি। অতএব এক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে নীরব থেকে, তাঁর সামাজিক মতেরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। তার থেকেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর চাইতে বড় মন ও বড় প্রাণ নিয়ে, এ যুগে ভারতবর্ষে অপর কোনও ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নি। মানুষমাত্রেরই জ্ঞানের আশ্রয় হচ্ছে দুটি বাইরের জিনিস—এক মানব-সমাজ আর এক বিশ্ব। ইংরাজি-দর্শনের ভাষায় যাকে cosmic consciousness এবং social consciousness বলে, মানুষমাত্রেরই মনে এ দুই consciousness অল্পবিস্তর আছে।

এ বিশ্বের অর্থ কি, এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধ ইহ-জীবনের কি অনন্ত কালের এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে cosmic consciousness, এবং সকল ধর্ম্ম, সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

অপর পক্ষে ইহ-জীবনে কি উপায়ে আমার অভ্যুদয় হবে, সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি তার প্রতি আমার কর্ত্তব্যই বা কি, কিরূপ কর্ম্ম সমাজের পক্ষে এবং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে social consciousness, এবং পলিটিক্স আইন শিক্ষা প্রভৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মঙ্গল সাধন করা।

নিত্য দেখতে পাই যে, এ দেশের লোকের মনে এদানিক এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে যে, ভারতবর্ষে পুরাকালে ছিল একমাত্র

cosmic consciousness এবং ইউরোপে বর্ত্তমানে আছে শুধু social consciousness ; আমাদের দেশের শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে এর প্রতিবাদ করছে। যাকে আমরা "মোক্ষশাস্ত্র" বলি, তা cosmic consciousness হতে উদ্ভূত আর যাকে আমরা "ধর্ম্মশাস্ত্র" বলি, তা social consciousness হতে উদ্ভূত। জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ সেকালে ছিল ঠিক উল্টো উল্টো পথ। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসার যে কি প্রভেদ, তা যিনি বেদান্তের দু-পাতা উল্টেছেন তিনিই জানেন। এ দুই যে বিভিন্ন শুধু তাই নয়, এ উভয়ের ভিতর স্পষ্ট বিরোধ ছিল। কর্ম্ম যখন ক্রিয়া কলাপে পরিণত হয়, তখন জ্ঞানকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য আর ধর্ম্ম যখন কর্ম্মহীন জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন কর্ম্মকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় করবার জন্য ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ ছিল যে, কর্ম্মহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন কর্ম্ম অন্ধ। রামমোহন রায় এঁদেরই বংশধর, এঁদের পাঁচজনেরই একজন।

(৩)

তিনি জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় করতে ব্রতী হয়েছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই, সেকালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তিনি গৃহী হয়েও ব্রহ্মজ্ঞানী হবার ভাণ করতেন, এক কথায় তিনি ছিলেন একজন "ভাক্তজ্ঞানী"।

এই ভাক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গৌণ, অপ্রধান ইত্যাদি। এ বিশেষণে বিশেষিত হতে রামমোহন রায় কখনই আপত্তি করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, তিনি যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন, এমন

স্পর্দ্ধা তিনি কখনই রাখেন নি। তবে গৃহীর পক্ষে যে বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপই একমাত্র সেব্য-ধর্ম্ম এবং গৃহস্থের পক্ষে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, একথা যেমন ন্যায়বিরুদ্ধ, তেমনি অশাস্ত্রীয়। এ কথার উত্তরে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা যোগবাশিষ্ঠের একটি বচন তাঁর গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। সে বচনটি হচ্ছে এই :—

"সংসার বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ং ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ॥

অর্থাৎ—

"যে ব্যক্তি সংসার-সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা কহে, সে কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট অতএব অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য হয়।"

এ সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন—"যোগবাশিষ্ঠে ভাক্তজ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে"।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই দেখিয়ে দেওয়া যে, কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের একসঙ্গে চর্চ্চা করা যেতে পারে কি না, এইটিই ছিল সে যুগের আসল বিবাদস্থল। এ বিবাদ আমরা আজ করি নে, কেননা দেশসুদ্ধ লোক এখন গীতাপন্থী, এবং আপনারা সকলেই জানেন যে, লোকের ধারণা যে, গীতায় শুধু জ্ঞানকর্ম্মের নয়, সেই সঙ্গে ভক্তিরও সমন্বয় করা হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক আজ যে পথের পথিক হয়েছে, সে পথের প্রদর্শক হচ্ছেন রামমোহন রায়। সুতরাং ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও তিনিই হচ্ছেন এ যুগের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান মহাজন। যে শাস্ত্রের বচন সকল আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের মুখে মুখে ফিরছে, রামমোহন রায়কে সেই বেদান্ত-শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বললেও

অত্যুক্তি হয় না। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে, সেকালে একদল পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, উপনিষদ্ বলে সংস্কৃত ভাষায় কোন শাস্ত্রই নেই, ইশ কেন কঠ প্রভৃতি নাকি তিনি রচনা করেছিলেন। এ অভিযোগ এত লোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন যে, রামমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য প্রকাশ্যে এই জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই কলিকাতা সহরের শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীতে গেলেই সকলে দেখতে পাবেন যে, বেদান্ত শাস্ত্রের সকল পুঁথিই তাঁর ঘরে মজুত আছে। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করবার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের বিপক্ষদলের সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত।

স্কচ দার্শনিক Dugald Stewart বলেছিলেন যে, সংস্কৃত বলে কোন ভাষাই নেই—ইংরেজদের ঠকাবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ঐ একটি জালভাষা বার করেছে। একথা শুনে এককালে আমরা সবাই হাসতুম, কেননা সেকালে আমরা জানতুম না যে, এই বাঙলা দেশেই এমন একদল টোলের পণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের মতে বেদান্ত বলে কোন শাস্ত্রই নেই, বাঙালীদের ঠকাবার জন্য রামমোহন রায় ঐ একটি জাল-শাস্ত্র তৈরি করেছেন। এই জালের অপবাদ থেকে রামমোহন রায় আজও মুক্তি পান নি। আমাদের শিক্ষিত সমাজে আজও এমন সব লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁদের বিশ্বাস—"মহানির্ব্বাণ তন্ত্র" রামমোহন রায় এবং তাঁহার গুরু হরিহরানন্দ ভারতী এই উভয়ে মিলে জাল করেছেন। এঁরা ভুলে যান যে, দলিল লোকে জাল করে, শুধু আদালতে পেশ করবার জন্য। এই কারণেই টোলের

পণ্ডিত মহাশয়েরা "দত্তক চন্দ্রিকা" নামক একখানি গোটা স্মৃতিগ্রন্থ রাতারাতি জাল করে ইংরেজের আদালতে পেশ করেছিলেন। সে জাল তখন ধরা পড়ে নি, পড়েছে এদানিক। ঈশ কেন কঠ এমন কি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র পর্য্যন্ত কোনও আদালতে গ্রাহ্য হবে না, ও-সবই irrelevant বলে rejected হবে। সুতরাং রামমোহন রায়ের পক্ষে মোক্ষশাস্ত্র জাল করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে যে লোকে "মহানির্ব্বাণকে" জাল মনে করে তার কারণ তারা বোধ হয় "দত্তকচন্দ্রিকা"-কেও genuine মনে করে। এই শ্রেণীর বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মূলে আছে একমাত্র জনশ্রুতি। এই এক-শ' বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষার বলে আমাদের বিচার বুদ্ধি যে আজও ফণা ধরে ওঠে নি, তার কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সে বুদ্ধি স্বল্পজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আটকে পড়েছিল, আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সে বুদ্ধি আমাদের অতি-জ্ঞানের চাপে মাথা তুলতে পারছে না। আমি আশা করি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বাঙালীর বিদ্যার বোঝা কতকটা লঘু হয়ে আসবে আর তখন বাঙালীর বুদ্ধি স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াবার একটু অবসর পাবে।

(৪)

রামমোহন রায় সম্বন্ধে আর একটি লৌকিক ভুল ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন ইংরাজি শিক্ষার একটি product, অর্থাৎ—ইউরোপের কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাবেই তাঁর মন তৈরি হয়েছিল, এক কথায় তিনি আমাদেরই জাত। আমার ধারণা যে অন্যরূপ সে কথা

আমি পূর্ব্বেই বলেছি। আমি আজ বছর তিনেক আগে এই মত প্রকাশ করি যে :—

"Bengal produced in the last century a man of colossal intellect and marvellous clairvoyance,—Rajah Ram Mohan Roy. * * * British India up to now has not produced a greater mind, and he remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age and the genius of our ancient land. He looked at European civilisation from the pinnacle of Indian culture aad saw and welcomed all that was living and life-giving in it."—

আমি অতঃপর আপনাদের কাছে যা কিছু নিবেদন করব, তা সবই স্বমত সমর্থন করবার অভিপ্রায়ে।

রামমোহন রায় যে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করবার পূর্ব্বে, একমাত্র ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে ধর্ম্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার দলিল আছে।—এ বিষয়ে তিনি কতক আরবি এবং কতক ফার্সি ভাষায় যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আজকালকার ভাষায় যাকে স্বাধীনচিন্তা বলে তা তিনি কোনও বিলেতি-গুরুর কাছে শিক্ষা করেন নি। নির্ভিকতায় চিন্তাশীলতায়, তাঁর হাতের এই প্রথম রচনা, Mill's Three Essays on Religion-প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবার উপযুক্ত।

তার পর তাঁর বাঙলা ও ইংরাজি লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে

তিনিই জানেন যে, পৌত্তলিকতার মত খৃষ্টান ধর্ম্মকেও তিনি সমান প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে ও-ধর্ম্মও আসলে একটি পৌরাণিক ধর্ম্ম, অতএব তাঁর মতো—শঙ্করের শিষ্যের নিকট তা অগ্রাহ্য। রামমোহন রায়কে শঙ্করের শিষ্য বলায় আমি নিজের মত প্রকাশ করছি নে। "গোস্বামীর সহিত বিচার" পড়ে দেখবেন যে, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে তিনি "আচার্য্যের শিষ্য"। আজকের দিনে এ শিষ্যত্ব অস্বীকার করাতেই আমরা সাহসের পরিচয় দেই; কিন্তু সেকালে এ কথা স্বীকার করায় তিনি অতি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশে তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিপত্তি সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে অপ্রতিহত ছিল। আর যাঁরা 'চৈতন্যচরিতামৃত' আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন যে, উক্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, স্বয়ং চৈতন্য-দেব সার্ব্বভৌমকে স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন যে, তিনি বেদান্ত মানেন কিন্তু আচার্য্য মানেন না, অর্থাৎ—তিনি উপনিষদ্ মানেন কিন্তু তার শাঙ্করভাষ্য মানেন না। সে যাই হোক, এ কথা নিঃসন্দেহ যে ইউরোপের ধর্ম্মমত রামমোহন রায়ের মনের উপর প্রভুত্ব করে নি।

তার পর ইউরোপের প্রাচীন কিম্বা অর্ব্বাচীন দর্শনের সঙ্গে যে তাঁর কোনরূপ পরিচয় ছিল তার প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সে-শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তার শিক্ষা তাঁর মনের উপর দিয়ে, অইল-ক্লথের উপর দিয়ে জল যে রকম গড়িয়ে যায়, সেই ভাবে গড়িয়ে গিয়েছিল, তাতে করে তাঁর মনকে ভেজাতে পারে নি।

অতএব আমি জোর করে বলতে পারি যে, রামমোহনের Cosmic consciousness ছিল ষোল আনা ভারতবর্ষীয়। সত্য

কথা বলতে গেলে তিনি এ যুগে বাঙালা দেশে প্রাচীন আর্য্যমন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে মনের পরিচয় আমি এখানে দু' কথায় দিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে কাণ্টের দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম pure reason, দ্বিতীয় practical reason আর তৃতীয় হচ্ছে æsthetic judgment. আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যার বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করেছিলেন, সে হচ্ছে এক pure reason আর এক practical reason এবং রামমোহনের অন্তরে এই দুই reason-ই পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রকে কখনো দর্শন শাস্ত্র বলে গ্রাহ্য করেন নি, রসতত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব বলে ভুল করেন নি, অর্থাৎ—মানুষের মনের æsthetic-অংশের তাঁর কাছে বিশেষ কিছু মর্য্যাদা ছিল না। বেদান্তের ধর্ম্ম Spiritual কিন্তু emotional নয়। মীমাংসার ধর্ম্ম ethical কিন্তু emotional নয়, অপর পক্ষে খ্রীষ্টান বৈষ্ণব মুসলমান প্রভৃতির ধর্ম্মে emotional-অংশ অতি প্রবল এবং সকল দেশের সকল মূর্ত্তি-পূজার মূলে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ আছে।

পাছে আমার কথা কেউ ভুল বোঝেন সেই জন্য এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, emotion শব্দ আমি মানুষের প্রতি মানুষের রাগদ্বেষ অর্থেই ব্যবহার করেছি, কেননা anthropomorphic ধর্ম্ম-মাত্রেরই সেই emotion হচ্ছে যুগপৎ ভিত্তি ও চূড়া। এ ছাড়া অবশ্য cosmic emotion বলেও একটি মনোভাব আছে, কেননা তা না থাকলে মানুষের মনে cosmic consciousness জন্মাতই না। আদিরসই এ জগতে একমাত্র রস নয়, অনাদি রস বলেও একটি রস আছে, যাঁরা এ রসের রসিক তাঁদের কাছেই উপনিষদ হচ্ছে মানব-

মনের গগনচুম্বি কীর্ত্তি। বলা বাহুল্য মানুষ মাত্রেরই মনে এই উভয়-বিধ emotion-এর স্থান আছে। এর মধ্যে কার মনে কোন্‌টি প্রধান সেই অনুসারেই তাঁর ধর্ম্মমত আকার ধারণ করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের একটি নাতিদীর্ঘ জীবনচরিত ইংরাজি ভাষায় বিলাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তাঁর নাম গোপন রেখেছেন। এ পুস্তকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে এই যে, তিনি বিলাতে গিয়ে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন, এবং লেখকের বিশ্বাস তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে সম্ভবত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করতেন, এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি যে উক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের ফলে তার প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন এ কথা গ্রাহ্য করায় বাধা নেই। বাইবেলের যে অংশ রামমোহনের ভাষায় বলতে হলে, "বড়াই বুড়ির কথায়" পরিপূর্ণ, তিনি সেই অংশের উপরেই বরাবর তাঁর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে এসেছিলেন; কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের যে অংশ spiritual এবং ethical সে অংশের প্রতি অনুকূল হওয়া ছাড়া উদারচেতা লোকের উপায়ান্তর নেই। আর রামমোহনের স্বভাবে আর যে দোষই থাকুক তিনি সকীর্ণমনা ছিলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে যে গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না, তিনি যে একটি নতুন সম্প্রদায় গড়তে চান নি, কিন্তু স্বজাতিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তার পরিচয় আদি ব্রাহ্ম-সমাজের trust deed-এ পাবেন। পৃথিবীতে আমরা দু-জাতীয় অতি-মানুষের সাক্ষাৎ পাই, এক যাঁরা saviour, অর্থাৎ—অবতার হিসেবে গণ্য আর এক যাঁরা liberator-হিসেবে

গণ্য। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।

(৫)

আজকের সভায় আমি বিশেষ ভাবে রামমোহন রায়ের social consciousness-এর পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। তবে তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় না দিলে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অঙ্গহীন হয় বলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁর দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছি। কারও ছবি আঁকতে বসে তাঁর মাথা বাদ দিয়ে দেহটি আঁকলে সে চিত্র যে পূর্ণাঙ্গ হয় না তা বলাই বাহুল্য।

রামমোহন রায় যখন যুবক তখন ইংরাজ এ দেশের একছত্র রাজা হয়ে বসেছেন। সমগ্র দেশ তখন ইংরাজের রাষ্ট্রনীতির অধীন হয়ে পড়েছে, আমাদের সমগ্র জীবনের উপর ইংরাজী-সভ্যতার প্রভাব এসে পড়েছে। ইংরাজের শাসন ও ইংরাজী-সভ্যতার প্রভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্ত্তন ঘটাবে, এ সত্য সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। এই অতুল শক্তিশালী নব-সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অন্তত আত্মরক্ষার জন্যও সে সভ্যতার ধর্ম্মকর্ম্মের পরিচয় নেওয়াটা নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই যুগসন্ধির মুখে একমাত্র রামমোহন রায়ের অন্তরে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর আত্মজ্ঞান লাভ করেছিল। রামমোহন এই মহা সত্য আবিষ্কার করেন যে এই নব-সভ্যতার সাহায্যে ভারতবাসী শুধু আত্মরক্ষা নয় স্বজাতির আত্মোন্নতি করতে পারবে। তাই জাতীয় আত্মোন্নতির যে পথ তিনি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অদ্যাবধি আমরা সেই পথ ধরে

চলেছি। ইতিমধ্যে আর কেউ কোনও পথ আবিষ্কার করেছেন বলে ত আমার জানা নেই। যাকে সময়ে সময়ে আমরা নূতন পথে যাত্রা বলি সে রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত মার্গে পিছু হটবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬)

পৃথিবীতে যে সকল লোককে আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় মন ও জাতীয় জীবনকে এমন একটা নতুন পথ ধরিয়ে দেন, যে-পথ ধরে মানুষে মনে ও জীবনে অগ্রসর হয়। যে পথে অগ্রসর হয়ে অতীত ভারতবর্ষ বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছে সে পথের তিনিই হচ্ছেন সর্ব্বপ্রথম দ্রষ্টা এবং প্রদর্শক। আমাদের জীবনে যে নবযুগ এসেছে তিনিই হচ্ছেন সে যুগের আবাহক।

ইংরাজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনের ও মনের যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটবে, ভারত-সভ্যতা যে নব কলেবর ধারণ করবে এ সত্য সর্ব্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি একমাত্র লোক ছিলেন, যাঁর অন্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাঙালা-লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে এক রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনও বাঙালীর এ চৈতন্য হয় নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানীর হাতে পড়ায়, শুধু রাজার বদল হল না, সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হল। ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন সব নব-শক্তি এসে পড়ল যার সমবায়ে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষে একটি নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা গঠিত হল। এবং সে সকল শক্তি যে কি

এবং তার ভিতর কোন কোন শক্তি আমাদের জাতি গঠনের সহায় হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, কেননা দেড়শ' বৎসর ইংরাজের রাজ্যে বাস করে এবং প্রায় একশ' বৎসর ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেও আমাদের মধ্যে আজ খুব কম লোক আছে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য স্পষ্ট। সম্যক জ্ঞানের অন্তরে কোন দ্বিধা নেই, কোনও ইতস্তত নেই। সে জ্ঞান কিন্তু শুধু স্কুল-কলেজে বই পড়ে লাভ করা যায় না, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা ব্যতীত কেউ আর যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন না। আপনারা মনে রাখবেন যে, রাজা রামমোহন ইংরাজের স্কুল-কলেজেকখনো পড়েন নি, এবং ইংরাজি শিক্ষার সম্বল নিয়ে মনের দেশে যাত্রা সুরু করেন নি। সংস্কৃত আরবি ও ফার্সি এই তিন ভাষায় ও শাস্ত্রে শিক্ষিত মন দিয়েই তিনি ইংরাজি সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে বসেন এবং তার কোনও অংশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার কোন কোন শক্তিকে সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে অঙ্গীকার করেন।

(৭)

জনরব এই যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে দেশের লোককে খৃষ্ট ধর্ম্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করেছেন, সে আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যে লেখনীধারণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমি নিম্নে তার একটি লেখা থেকে কতক অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে আপনারা রামমোহন রায়ের মনের ও সেই সঙ্গে তাঁর বাঙালা-রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবেন।

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরাজের অধিকার হইয়াছে। তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে, তাঁহাদের নিয়ম এই যে, কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষাচরণ করেন না। আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন।

কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ, যাহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মুসলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকার করিতেছেন।

প্রথম প্রকার এই যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন, যাহা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন।

তৃতীয় প্রকার এই, কোন নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোন কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন, যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।

যদ্যপিও যিশুখৃষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকার ছিল না। সেইরূপ মিসনারিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্য যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে, যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়, এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন, তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন।

কিন্তু বাঙলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামমাত্রে লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর দৌরাত্ম্য

করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন, তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না।

এই তিরস্কারের ভাগী আমরা নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা-ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে, যখন একদেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে, সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয়, তথাপি ঐ দুর্ব্বল-দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে।" *

* * * *

যুক্তিযুক্ত ও সত্যমূলক হলে, বিদ্রূপ যথেষ্ট ভদ্র হয়েও যে কতদূর সাংঘাতিক হতে পারে, উপরোক্ত বাক্যক'টি তার একটি চমৎকার উদাহরণ। এই শ্রেণীর মারাত্মক বিদ্রূপে রামমোহন রায় সিদ্ধহস্ত। বিপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে শিষ্টতা তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি; কিন্তু "হিংসা-ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা"—তাঁর স্বভাব ও শিক্ষা দুয়েরি বিরুদ্ধে ছিল। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ কবি Henri Heine বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর গোরের উপর যেন এই কটি কথা লেখা থাকে যে, He was a brave soldier in the war of liberation of humanity"—এ খ্যাতি রামমোহন রায় অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পারেন। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি অহিংসামূলক ধর্ম্ম, তাঁর মনের উপর কখনো

* পাঠকের বোঝবার সুবিধার্থে উদ্ধৃতাংশের স্থানে স্থানে punctuation ঠিককরে দেওয়া হয়েছে।

প্রভুত্ব করে নি, তিনি ছিলেন বেদপন্থী-ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ—রাজসিকতার মাহাত্ম্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না। তামসিকতা যে অনেক স্থলে সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশ ধারণ করে, এ সত্যও তাঁর সম্পূর্ণ জানা ছিল। আমরা এ যুগের বাঙালী-লেখকেরা, তাঁর কাছথেকে একটি মহাশিক্ষা লাভ করতে পারি। তর্কক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা করে কি করে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা যায়, তার সন্ধান আমরা রামমোহন রায়ের লেখার ভিতর পাব, অবশ্য যদি আমরা সাহিত্যে একমাত্র বৈধহিংসার চর্চ্চা করতে প্রস্তুত থাকি। যা অসত্য যা অন্যায় যা অবৈধ তার পক্ষে যিনি লেখনী ধারণ করবেন তাঁর গুরু রামমোহন রায় কখনই হতে পারেন না। কেননা তাঁর শাস্ত্র-শাসিত মন অধর্ম্ম-যুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ-ক্ষেত্রে রামমোহন রায় কিসের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছিলেন?—খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে নয়, কেন না কোন ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর নিজের কথা এই—

"নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার-সহ হয় না। তবে বিচার বলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক, অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ পাণ্ডতের ক্ষুদ্রগৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন। যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে, উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এম নিয়ম নহে।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তিনি এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের

পদ্ধতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কেননা উক্ত উপায়ে লোকের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটানো সকল দেশেই, উপদ্রববিশেষ এবং প্রবল রাজার জাতের পক্ষে দুর্ব্বল প্রজার জাতের উপর এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অত্যাচার। রামমোহন রায় সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই নির্ভিক প্রতিবাদ করেছিলেন। যে যুগে ইংরেজের নাম-মাত্রে লোকে ভীত হত, সে যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতি-বাদ করায় তিনি যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন সে সাহস সকল দেশে সকল যুগেই দুর্ল্লভ।

(৮)

আজকের দিনে যে-মনোভাবকে আমরা জাতীয়-আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বলি, রামমোহন রায়ের এই ক'টি কথায় তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক অপর কোনও ব্যক্তির মনে এ মনোভাবের যে লেশমাত্র ছিল তার কোনই নিদর্শন নেই। কিন্তু যেটা বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মিছা আত্ম-শ্লাঘার নাম গন্ধও নেই, অপর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগ্লানিও আছে। সে যুগের বাঙালী যে দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত ও দীন ছিল সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এবং কিসে স্বজাতীর দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও দীনতা দূর করা যায় সেই ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা, আর তাঁর জাতীয় উন্নতি-সাধনের সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বজাতিকে মনে ও জীবনে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যবান করে তোলা। এই কথাটি মনে রাখলে তাঁর সকল কথা সকল কার্য্যের প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে

পারি। তার পর স্বজাতিকে তিনি উন্নতির যে-পথ দেখিয়ে দিয়ে-ছিলেন সে পথ সুপথ কি কুপথ তার বিচার করতে হলে রামমোহন রায় কোন্ সত্যের উপর তাঁর মতামতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীতে যে-সকল লোকের মতামতের কোনও মূল্য আছে তাঁদের সকল মতামতের মধ্যে একটা সঙ্গতি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কেননা তাঁদের নানা বিষয়ে নানাজাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানস-প্রকৃতি। রাজা রামমোহন রায় কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক যে-কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন, সে সকলের ভিতর দিয়ে তাঁর অসামান্য স্বাধীনতা-প্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে। তিনি যে বেদান্তের এত ভক্ত তার কারণ, ও-শাস্ত্র হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র। যে জ্ঞানের লক্ষ্য মুক্তি, ফল মুক্তি, সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার উপদেশ তিনি চিরজীবন স্বজাতিকে দিয়েছেন। এ মুক্তি কিসের হাত থেকে মুক্তি?—এর দার্শনিক উত্তর হচ্ছে, অবিদ্যার হাত থেকে। এই অবিদ্যা বস্তু যে কি, সে বিষয়ে তর্কের আর শেষ নেই, ফলে অদ্যাবধি কেউ এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। অবিদ্যার মেটাফিজিক্যাল রহস্য ভেদ করবার বৃথা চেষ্টা না করেও, সহজ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায়—বেদান্তের প্রতিপাদ্য মোক্ষ হচ্ছে ব্রহ্ম-বিষয়ক লৌকিক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ ধারণা হতে মনের মুক্তি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, বেদান্ত শাস্ত্র নেতিমূলক। বেদা-ন্তের "নেতি নেতি"-র সার্থকতা, সাধারণ লোকের ব্রহ্ম বিষয়ক সকল অলিক ধারণার নিরাস করায়। এ বিষয়ে শঙ্করের মত তাঁর মুখ

থেকেই শোনা যাক। বেদান্তের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যের দুটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত।"

অন্বার্থ—"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান যিনি ইদন্তারূপে (এই, অমুক অথবা অন্য কোন প্রকারে) উপাসিত হন না।

"ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি।"

অন্বার্থ—"বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে ইদন্তারূপে (কোনরূপ বিশেষণ দিয়া) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক নহে। শাস্ত্র এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ ইদং জ্ঞানের অবিষয়"।

বলাবাহুল্য ধর্ম্মজ্ঞানের রাজ্যে, এহেন মুক্তির বারতা পৃথিবীর অপর কোনও দেশে অপর কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এ মত কিন্তু নাস্তিক মত নয়, এ মত শুধু সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ আস্তিক মতের বিরোধী।

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য্য-সভ্যতার চরম বাণী, সামাজিক সভ্যতা তেমনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় আর্য্য-সভ্যতার চরম বাণী। এ সত্য আজকের দিনে আমাদের সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ, কেন না এ যুগের ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র যে কি তা ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে, অর্থাৎ—একশ' বৎসর পূর্ব্বে—একমাত্র রামমোহন রায়ের চোখে এ সত্য ধরা পড়ে। ইউরোপের ঐ মহামন্ত্রই যে আমাদের যথার্থ সঞ্জিবনী মন্ত্র হবে এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর সকল কথা সকল ব্যবহারের অটল ভিত্তি। তাই তিনি একদিকে যেমন ইউরোপের পৌরাণিক ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করেছিলেন, অপরদিকে তিনি

তেমনি ইউরোপের সামাজিক ধর্ম্ম সোৎসাহে সানন্দে অঙ্গীকার করে ছিলেন। এই liberty-র ধর্ম্মকেই আত্মসাৎ করে ভারতবাসী যে আবার নবজীবন, নবশক্তি লাভ করবে এই সত্য প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মহাব্রত।

(৯)

Liberty শব্দটা আজকের দিনে এত অসংখ্যলোকের মুখে মুখে ফিরছে, এক কথায় এতটা বাজারে হয়ে উঠেছে যে, ভয় হয়, যে অধিকাংশ লোকের মুখে ওটা একটা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের কথাটাকে আমরা যে একটা বুলিতে পরিণত করেছি এ কথা ত আর সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। যে কথা মুখে আছে মনে নেই, যদিও বা মনে থাকে ত জীবনে নেই—তারই নাম না বুলি? অতএব এস্থলে, বর্ত্তমান ইউরোপ liberty শব্দের অর্থে কি বোঝে সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান ইতালির একজন অগ্রগণ্য লেখকের কথা এখানে বাঙলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"প্রাচীনকালে liberty শব্দের অর্থে লোকে বুঝত শুধু দেশের গভর্ণমেণ্টকে নিজের করায়ত্ত করা। বর্ত্তমানে লোকে liberty বলতে শুধু রাজনৈতিক নয় সেইসঙ্গে মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতার কথাও বোঝে। অর্থাৎ—এ যুগে liberty-র অর্থ, চিন্তা করবার স্বাধীনতা, কথা বলবার স্বাধীনতা লেখবার স্বাধীনতা, নানা লোক একত্র হয়ে দল বাঁধবার স্বাধীনতা, বিচার করবার স্বাধীনতা, নিজের মত গড়বার এবং সে মত প্রকাশ করবার, প্রচার করবার

স্বাধীনতা। মানুষমাত্রেই এ সকল ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতার স্বভাবতই অধিকারী, এ স্বাধীনতা, কোনও church (ধর্ম্ম-সঙ্ঘ) কর্ত্তৃকও দত্ত নয়, কোনও রাজশক্তি কর্ত্তৃকও দত্ত নয়। এর উল্টোমত হচ্ছে এই যে, হয় ধর্ম্ম-সঙ্ঘ, নয় রাজশক্তি সর্ব্বশক্তিমান, অতএব ব্যক্তির ব্যক্তি হিসেবে কোনই স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একটা জাতীয় সমূহের অন্তরে লীন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়, সে সমূহ রাজাই হোক আর রাজ্যই হোক, church-ই হোক আর Pope-ই হোক।"

লেখকের মতে, যে-দেশে যে-সমাজে, ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অধিকারী নয়, সে-দেশের লোকমাত্রেই দাস—সে-দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মিছা ও অর্থ-শূন্য। আমি ইচ্ছা করেই De Sanctis-এর মত আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, কেন না উক্ত লেখককে ইতালির রাজনৈতিক স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য আজীবন অশেষ অত্যাচার বিশেষ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায় liberty শব্দের এই নূতন অর্থই গ্রহণ করেছিলেন, এবং স্বজাতিকে, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব, হতে মুক্তি দিতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন। Liberty-র নূতন ধারণার ভিতর একটি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, সে তত্ত্ব এই যে, স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনীশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এবং বহুলোকের মনে ও জীবনে এই শক্তি স্ফূর্ত্ত হলেই জাতীয় জীবন যুগপৎ শক্তি ও উন্নতি লাভ করে। মানুষকে দাস রেখে মানব-সমাজকে স্বাধীন করে তোলার যে কোনও অর্থ নেই এ জ্ঞান

রামমোহন রায়ের ছিল, কেন না তিনি হেগেল প্রমুখ জর্ম্মান দার্শনিকদের শিষ্য ছিলেন না।

(১০)

রামমোহন রায় জানতেন যে তাঁর স্বজাতি, দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত ও দীন, এবং এরূপ হবার কারণ, সে জাতির নয়শ' বছরের পূর্ব্ব ইতিহাস। এবং এই দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত ও দীন জাতির, দুর্ব্বলতা, ভয় ও দৈন্য কি উপায়ে দূর করা যায় এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভাবনা। সুতরাং তাঁকে একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্টের আইন কানুনের দিকে নজর রাখতে হয়েছিল, অপরদিকে বাঙালীর মানসিক ও সামাজিক মুক্তির উপায়ও নির্দ্ধারণ করতে হয়েছিল।

ইংরাজিতে যাকে বলে, Civil and religious liberty, তার অভাবে কোনও জাতি যে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না এ সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। সেই কারণে—স্বজাতির Civil ও religious liberty-র রক্ষাকল্পে তখনকার ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ্জকে তিনি যে একখানি খোলা-চিঠি লেখেন, সে পত্রে তিনি এতদূর স্বাধীন মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক Bentham এ রচনাকে দ্বিতীয় Ariopagitica-স্বরূপে শিরোধার্য্য করেন। পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এ পত্রখানি একখানি মহামূল্য দলিল। দুঃখের বিষয় এই যে, খুব কম বাঙালীর এ দলিলখানির সঙ্গে পরিচয় আছে এবং একালের পলিটিসিয়ানদের মোটেই নেই। নেই যে, সেটি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কেন না যে-কংগ্রেস তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবসার প্রধান সম্বল, সেই কংগ্রেসের মূল সূত্রগুলির স্থাপনা ১৮৩২

খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ই করেন। অদ্যাবধি আমরা শুধু তার টীকাভাষ্যই করছি।

আধ্যাত্মিক দাসবুদ্ধির মত সামাজিক দাসবুদ্ধিরও মূলে আছে অবিদ্যা। আজকালের ভাষায় আমরা যাকে অজ্ঞতা বলি, শাস্ত্রের ভাষায় তাকে ব্যবহারিক অবিদ্যা বলা যেতে পারে।

জাতীয় মনকে এই অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। যে-জ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু ছেরেপ কল্পনা-মূলক সে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। রামমোহন রায় আবিষ্কার করেন যে, ইউরোপীয়দের অন্তত দু'টি শাস্ত্র আছে, সত্য যার ভিত্তি। এক বিজ্ঞান আর এক ইতিহাস। এই বিজ্ঞানের প্রসাদে এ বিশ্বের গঠন ও ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় আর এই ইতিহাসের কাছ থেকে মানব-সমাজের উত্থান পতন পরিবর্ত্তনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, অন্তত এ দুয়ের চর্চ্চার ফলে মানুষের মন মানুষ-সম্বন্ধে ও বিশ্ব-সম্বন্ধে "বড়াই বুড়ির কথার" প্রভুত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন অবিদ্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার নাম মুক্তি লাভ করা এবং মুক্তপুরুষই যথার্থ শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু যথার্থ মুক্তি সাধনা সাপেক্ষ। রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক ইউরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তারই ফলে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বাঙালী জাতির স্থান সবার উপরে। কি সাহিত্যে, কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি, বাঙালীর চিন্তা বাঙালীর কর্ম্ম আজ যে বাকি ভারতবর্ষের

আদর্শ, বাঙালী যে এ যুগে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের যুগপৎ শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, তার কারণ একটি বাঙালী মহাপুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বাঙালীর মন বাঙালীর জীবন আজ একশ' বৎসর ধরে অগ্রসর হয়েছে। এক কথায় আমাদের জাতীয় প্রতিভা রামমোহন রায়ের মনে ও জীবনে সম্পূর্ণ সাকার হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং রামমোহন রায়ের মনে বাঙালী জাতি ইচ্ছা করলে তার নিজের মনের ছবি দেখতে পারে। বাঙালী জাতির মনে যে সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহন রায়ের অন্তরে সেই সকল শক্তি সংহত ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ রামমোহন রায়ের মন ও প্রকৃতি যদি অ-বাঙালী হত তাহলে আমরা পুরুষানুক্রমে কখনই শিক্ষায় ও জীবনে অজ্ঞাতসারে তাঁর পদানুসরণ করতুম না।

এ কথাটা আজ স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, কেননা রাজনীতির নামে আজ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে এমন সব প্রস্তাব আসছে যা মেনে নিলে বাঙালী তার জাতীয় প্রকৃতির উল্টো টান টানতে প্রস্তুত হবে, ফলে তার জাতীয় প্রতিভা হারিয়ে বসবে। আর বাঙালী যদি তার স্বধর্ম্ম হারায় তাতে যে শুধু বাঙলার ক্ষতি তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তাহলে যে ধূমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে। একদল আত্মহারা বাঙালী আজকের দিনে স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন বলে রামমোহন রায়ের আত্মাকে স্বজাতির সুমুখে খাড়া করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

নন্-কো-অপারেশন !

—:※:—

সমস্ত দুফুরটা বিছানায় শুয়ে আর বড় বড় নেতাদের নন্-কো-অপারেশন-এর উপর বক্তৃতা পড়ে' যখন মাথাটা ভীষণ রকম গরম হয়ে উঠ্‌ল, তখন বেড়াতে বেরুলুম্। একখানা ট্রামে উঠে বন্ধু অনিলের বাড়ীর দিকে চললুম। ট্রামে উঠে দেখি একদল কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারের সঙ্গে কণ্ডাক্‌টারের বচসা হচ্চে। ভলাণ্টিয়াররা সবাই বালক। ছেলেরা ট্রামের পয়সাটা ফাঁকি দিতে পাল্লে যেমন মনে করে কি যুদ্ধ জয়ই কললুম, এরাও দেখলুম তাই। ভলাণ্টিয়াররা বলছে, "আমরা পয়সা দেব না—কারণ আমরা ভলাণ্টিয়ার"। কণ্ডাকটার বেগতিক দেখে ইন্‌স্‌পেকটারের মধ্যস্থতা মানল। ইন্‌স্‌পেকটারকেও ছেলেরা বললে, তারা পয়সা দেবে না, কারণ তারা মহাত্মা গান্ধীর লোক। ইন্‌স্‌পেকটার বল্লে, "আচ্ছা ছোড় দেও, গান্ধীজীকা লোক হ্যায়।" মনে মনে ভাবলুম, "উঃ কি প্যাট্‌রিঅটিজম্!" আমার পাশে দুটি যুবক বসেছিল। একজন অন্যকে বলল, "হুঁ হুঁ প্যাটরিঅটিজমটা চালানো হল কোম্পানির পয়সার উপর দিয়ে, নিজের পয়সার উপর হলে বোঝা যেত।" আমি মনে মনে বললুম, "উঃ কি পাষণ্ড! এসময়ে লোকের পয়সার কথা মনেও আসতে পারে!" সমস্ত পথটা ট্রামে আসতে আসতে রাগে আর তাদের দিকে একবারও ফিরে চাই নি।

অনিলের বাড়ীতে গিয়ে অনিল এবং অনিলের দাদাদের সঙ্গে

নন্-কো-অপারেশন ব্রত গ্রহণ করা উচিত কি না তাই নিয়ে মহা তর্ক জুড়ে দিলুম। যুক্তি দেখাতে দেখাতে একবার এমনি হাত ছুঁড়লুম যে, অনিলের নাক থেকে চশমাটা পড়ে ভেঙ্গে গেল। আমি কিন্তু তাতেও দমি নি। তর্কের স্রোত ক্রমাগত বয়ে যেতে লাগল। রাত ৯টা পর্য্যন্ত তর্ক করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লুম তখন বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু এতটা শ্রম পণ্ড হল, কারণ আমাতে আর অনিলেতে কিছুতেই অনিলের মেজদা'কে দলে টানতে পার্লুম না।

বাড়ী এসে যখন খেতে বসলুম, মা কাছে এসে বসলেন। মন কিন্তু সেই দিকে পড়ে আছে। "নন্-কো-অপারেশন—নন্-কো-অপারেশন!" খেতে খেতে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে উঠলুম, "বটেই ত, নন্-কো-অপারেশন ছাড়া আমাদের আর গতি নেই!" মা বললেন, "কি হ'ল, গলায় কাঁটা লাগ্‌ল?" আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, "না কিছু হয় নি ত"। আমার এই রকম ভাব গতিক আর অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখে মা একটু ভীত হয়ে পড়লেন। খেয়ে ওঠ্‌বার পর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে রে?" আমি মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললুম, "কৈ মা, কিছু হয় নি ত;" কিন্তু মুখে হাসি এল না। সে সময়ে কি হাসি আসবার সময়? মা বিশেষ ভীত হয়ে চলে গেলেন।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ খানা নিয়ে পড়তে বসে গেলুম। সমস্ত সকালটা কাগজ পড়ে কাটিয়ে দিলুম। দুফুরে আহারের পর ছাদে আমার ঘরটিতে বসে এই সমস্ত গভীর বিষয় আলোচনা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, টেরও পেলুম না।

* * * *

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি নে, কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন শুনতে পাচ্চি দূরে আকাশের উপর ভাসতে ভাসতে একটা চিল করুণ দীর্ঘ স্বরে ডাকছে চাঁ—ঈ—ঈ—ঈ। কি-জানি-কেন মনটা যেন কি-রকম করে উঠল। আমি চোখ চেয়ে চুপ করে যে আরাম কেদারাটার উপর ঘুমুচ্ছিলুম, সেইটার উপরই শুয়ে রইলুম। চিলটা ক্রমাগত ডাকতে লাগল চাঁ—ঈঈ—ঈই—। সমস্ত ছাদটা নিস্তব্ধ, আমার ঘরে একটুও শব্দ নেই—আর কানের ভিতর আসছে খালি সেই করুণ ক্ষীণ চিলের ডাক।

আমি উঠে চেয়ারখানাকে জানলার কাছে টেনে বসলুম। জানলাটার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দুটো নারকেল গাছের ডগা, আর তার পিছনে ঘন নীল আকাশ। এক টুকরো ছোট্ট স্বচ্ছ শাদা মেঘ নারকেল গাছ দুটোর মাঝখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। শরৎটা যে এতদূর এগিয়ে এসেছে তা আমি আগে খেয়াল করি নি। পাশে টেবিলটার উপর চেয়ে দেখি সকালের কাগজখানা পড়ে রয়েছে। তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—"নন্-কো-অপারেশন"! আমি কাগজখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই দূর নীল আকাশের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে রইলুম। যেন আকাশটা আগে ছিল না, আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি, এমনি ভাবে এমনি করে চেয়ে রইলুম। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই দুটো পংক্তি—

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছড়িয়ে গেল
ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।"

চোখের সামনে একখানি মুখ ভেসে উঠল, এমনি দিনে যাকে ছেড়ে আমি কখনও থাকতে পার্তুম না। অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সে মুখে। মুখখানি সুন্দর কি অসুন্দর আমার মনে নেই। শরতের আকাশের মতই উজ্জ্বল সে মুখের চোখ দুটি। আমি জীবনে ভুলবো না। কি শান্ত কি মধুর দৃষ্টি সে চোখে। সে এক দণ্ডে আমার অতি আপনার, অতি নিকট হয়ে গেল। অসহ্য আনন্দে মন ভরে উঠল। যাকে কখনও খুঁজি নি, অথচ যাকে না হলে আমার এক দণ্ডও চলবে না, এ যে সেই।

পিছন থেকে অনিল ডেকে উঠল, "কিরে বিকেল হ'ল, বেড়াতে যাবি নে? হাঁ, মেজদা'কে অনেকটা দলে টানা গেছে। নন্-কো-অপারেশন-এর গর্ভে যে কত সুফল আছে অনেক করে' কিছু বুঝিয়েছি।" আমি বললুম, "ভাই অনিল, এখন আর ও-সবের নাম করিস্ নে।" অনিল চম্‌কে উঠে বললে, "কেন রে?" আমি বললুম, "ভাল লাগছে না।" অনিল বড় বড় দুটো চোখ বার করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

শ্রীতারাদাস দত্ত

কবিকথা।

—:০:—

কোন্ বিরহের তীব্রসুরা পান করিলে কবি ?
পেয়ালা মাঝে জাগ্‌ল কাহার দীপ্ত মুখের ছবি ?
ছন্দেতে কার্ পায়ের নূপুর বাজ্‌ল তালে তালে—
কণ্ঠটি কার্ জড়িয়ে এল তোমার সুরের জালে !

নিমেষটিরে ধন্য ক'রে গাইলে তুমি গাথা—
নিমেষ তরে ভুলিয়ে দিলে বিশ্বমনের ব্যথা ;
একটি নিমেষ—মরুর মাঝে একটি জলের ধারা,
একটি নিমেষ—আঁধার সাঁঝে উজল সন্ধ্যাতারা।

চাইলে না তো বিত্ত কোনো বিশ্বসভার মাঝে—
কোন্ গরবীর কণ্ঠমালা শিরে তোমার রাজে !
নৈশপুরের কোন্ দেবী সে, যার রূপেরি ছটা
উজল ক'রে রাখলে আয়ুর দীর্ঘ বরষ ক'টা !

গোলাপবনের মাঝখানেতে ছোট্ট কুটিরখানি,
উদাস হাওয়ায় মিশ্‌ত যেথায় স্রোতস্বিনীর বাণী—
সেইখানেতে তোমার রচা হৃদয়-ছ্যাঁচা গান
তুল্‌লে কাহার কণ্ঠবীণায় তীব্র করুণ তান !

রাজসভাতে ব'স্‌তে তুমি সবার শেষে আসি—
বাদ্‌শাজাদির মুখের 'পরে খেল্‌ত নাকি হাসি ?
চিকের পারে কাঁকনটি তার বাজ্‌ত মধুর বোলে,
অলক্-খসা ফুলটি এসে প'ড়ত নাকি কোলে !

* * * *

কোন্ সাহারায় রাত্রিশেষে গাঁথ্‌ছ তারার মালা ?
নিজের বোনা তাঁবুর মাঝে জাগ্‌ছে সে কোন্ বালা !
পেয়ালা হাতে কাট্‌বে রাতি ? সুর্‌মা-পরা আঁখি—
পিয়াস-আকুল-পথ-চাওয়া তার সফল হবে নাকি !

আস্‌বে নাকো ঝড়ের সাথে সর্ব্ব-নাশের দায়—
শেষ প্রহরের জের্‌টা টেনে ব্যগ্র-ত্বরিৎ পায় ?
মিলন-তৃষা উঠ্‌বে জ্ব'লে বিদ্যুতেরি সনে,
রক্ত বুকের উঠ্‌বে নেচে নিবিড় আলিঙ্গনে !

পাগল-করা চুম্বনে তার ওড়্‌না রবে মুখে ?
কাঁচলখানি টুট্‌বে নাকো তুষার-সাদা বুকে ?
অন্তরেতে ঝড়ের খেলা, বাইরে পড়ে বাজ—
শিথিল তনু, নীবির বাঁধন, আকুল পেশোয়াজ !

ওমর কবি ! ওমর কবি ! সেই নিমেষের নেশা
নিঃশ্বাসেরি মতই আজও বিশ্বপ্রাণে মেশা !
আজিও সে নিমেষটুকু দখিন্ হাওয়ার মত
মিলন-রাতের গোপন কপাট খুলিয়ে দেখায় কত !

চুম্বনাকুল ঠোঁটের কাঁপন, বিদায় চোখে-চাওয়া,
দুই বিরহের মধ্যে মিলন নিবিড় ঘন পাওয়া,
সজল দুটি মেঘের মাঝে বিদ্যুতেরি হাসি—
নিমেষটি সেই বিশ্বে ফোটায় সত্যে পরকাশি !

* * * *

সুখের তুমি নও তো শুধু আপন-ভোলা কবি—
ভাগ্য-দেবীর হাতের আঁকা শোণিত্-রাঙা ছবি
হৃদয়-পটে ফেল্‌লে ছায়া সত্য-আভাষ মত—
জ্ঞানের আলো ফুট্‌লো না তো পুঁথির মধ্যে যত !

ব্যাকুল হৃদি বৃথাই ঘুরে শান্তি কোথা মাগি'—
চিরন্তনী প্রশ্ন রহে বিশ্ব মনে জাগি' ;—
চিতার পারে, গোরের মাঝে—চক্রপাণির ডাকে
জীবন—সে কি দিচ্ছে সাড়া ভাগ্য-দুয়ার ফাঁকে !

কোথায় আলো ?—জ্ঞানের ভাতি অন্ধকারে ঘেরা,
ভাগ্য-দেবীর রুদ্ধ দুয়ার—রিক্ত হাতে ফেরা ;
বৃথাই শুধু হস্ত জুড়ে আকাশ পানে চাওয়া—
আছেন তিনি ? থাকুন তিনি—বিফল তাঁরে পাওয়া !

বৃথাই খোঁজা ?—বন্ধু, তোমার পেয়ালাটুকুর মাঝে,
তন্বী সাকীর কটাক্ষেতে বিরল মধুর সাঁঝে—
কিছুই কি নাই ? জীবন-সুরা অশ্রু দিয়ে মেশা ?
প্রণয়-মিলন—আর কিছু নয়—মুহূর্ত্তেকের নেশা ?

মর্‌মি মনের হুতাশ বহে বিশ্বে চিরতরে—
শান্তিবারি কোথায় সে কার পেয়ালা হ'তে ঝরে !
তীব্র ফেনিল কামের সুরা—প্রেমের নাহি দিশা—
ভণ্ডামিতে বিশ্ব মেটায় ক্ষুদ্র প্রাণের তৃষা !

* * * *

হাজার বছর পরে সে এক বাংলা দেশের কবি,
নিজের মাঝে দেখ্‌ছে তোমার দুঃখ সুখের ছবি।
বেহেস্ততে—জাহান্নমে—শূন্যে—যেথায় থাকো—
অর্ঘ্য-রচা তাহার আজি ব্যর্থ হবে না কো !

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

উড়ো চিঠি

—:*:—

জুন ১৩, ১৯২০

দুষ্টু মিনি

অতঃপর তুমি আর অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমি তোমার স্বামী আর তুমি আমার স্ত্রী, কেননা একদা—এ অতি অল্পদিনকার পূর্ব্বের "একদা"—একদা এক শীতের সন্ধ্যায় গোধূলি লগনে কোন এক বিশেষ বিবাহসভায় আমি পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র রীতিমত আবৃত্তি করেছি, আর ঠিক সেই বিবাহ-সভাতেই—তুমি দুষ্টু মিনি—তোমার ফুলের মত ছোট্ট হাতটুকুকে আমার হাতের উপর দিয়েছিলে। তোমার হাতের সেই প্রথম স্পর্শ। জান কি হয়েছিল? তোমার কি হয়েছিল তা শোন বলছি—যদিও তুমি তোমার দুষ্টুমি মেশানো রাঙা ঠোঁট দুটিকে উল্‌টিয়ে ঘোরতর প্রতিবাদের সুরে "কক্‌খনো না" বলে আমার কথার সত্যতাটাই প্রমাণ করবে। কিন্তু সে যাই হোক, বলছি শোন। সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ তোমার আঙুলের ডগা দিয়ে এসে আমার কানে বাজ্‌ছিল, আর আমি স্পষ্ট দেখছিলুম, তোমার কপাল থেকে বুক পর্য্যন্ত একেবারে তোমার পরা-চেলীর মতই লাল হয়ে উঠেছে। আর আমার কি হয়েছিল জান?—আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, ঐ রকম আমার মন্ত্র-পড়া আর তোমার হাত রাখার পর এ কথাটা আর তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমি তোমার স্বামী আর তুমি আমার স্ত্রী, কেননা দশ জনের মতে স্বামীর স্বামীত্ব আর স্ত্রীর স্ত্রীত্ব লাভ করবার এ-ই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

তার পর ব্যাপারটা এসে ঐ খানেই কিন্তু শেষ হল না। কেননা তুমি যে এখন কেবলই আমার স্ত্রী তাই নয়—শাস্ত্রানুসারে তুমি আমার শিষ্যাও বটে। সুতরাং যখন তুমি আমার শিষ্যা ও আমি তোমার গুরু তখন তোমার আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল শিক্ষার ভার আমার। কাজেই যখন আমি তোমার গুরু ও ত্রিবিধ শিক্ষার ভার আমার তখন বলছি, এর পর থেকে তুমি আমার সকল উপদেশ মানবে ও সকল আদেশ পালন করবে। তোমার গুরু যে তোমার শিক্ষাসম্বন্ধে কতদূর উৎসাহী তা এখনই দেখবে। কেননা এই চিঠিতেই আমি তোমার শিক্ষা সুরু করে' দিচ্ছি। এখন আমার প্রথম উপদেশ শোন। আমার প্রথম উপদেশ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ছাত্রীজীবনের অনিলা, প্রমীলা, চপলা, সরলা ইত্যাদি প্রমুখ বন্ধুবর্গকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়ে 'কায়েনমনসাবাচা' উষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা থেকে উষা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র আমাকেই ভালবাসবে।

ঐটেই হচ্ছে আমার প্রথম উপদেশ ও প্রধান উপদেশ। ঐটে যদি তুমি একান্ত মনে জ্বলন্ত প্রাণে অবহিত চিত্তে সমাহিত হৃদয়ে পালন করতে থাক তাহলে তোমার সকল অবহেলা ও অমনোযোগীতা চাই কি, উপেক্ষা করলেও করতে পারি।

এইখানে—তুমি যেমন দুষ্টু মিনি—আমি জানি প্রতিবাদের সুর তুলবে। তুমি বলবে যে আমার ঐ উপদেশ একান্ত স্বার্থপরতা-দোষ-

দুষ্ট। তোমার ঐ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার দুটি জবাব দাখিল করবার আছে। তা করছি।—

আমার প্রথম জবাব এই যে, আমাকে তুমি প্রকারান্তরে স্বার্থপর বলেছ, তাতে আমি ভয় পাই নে। কেন না এই জগতে স্বার্থপর নয় কে?

কথাটা শুনে তুমি একেবারে আকাশথেকে পড়বে জানি। তুমি বলবে মানুষ সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। সেই সত্যযুগের দধীচিমুনি থেকে এই কলিকালের নফর কুণ্ডু পর্য্যন্ত পরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলে, আর আমি বলছি কি না কোন্ লোকটা স্বার্থপর নয়! ঐ যে অমুক চাটুয্যে ধনের মায়া না করে কত কি বড় কীর্ত্তি করে গেল, ঐ যে অমুক মুখুয্যে প্রাণের মায়া না করে নৌকোড়ুবির সময়ে কত লোককে উদ্ধার করলে—এসব কি কিছুই না?—

সত্যি, কিন্তু তুমি জান আমার চিরকালের ঝোঁক সমস্ত বিষয়ের পিছন থেকে একটা সাধারণ নিয়ম টেনে বের করবার, অর্থাৎ—প্রত্যেক গতির পিছন থেকে একটা common principle বের করা। জড় জগতে যে গতি ও স্থিতি তার পিছনে একটা principle আছে, এ কথা বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে শুনবে, ও—তিলের পিছনেও যা, তালের পিছনেও তাই। মনোজগতে যে চলা-ফেরা—তার পিছনেও সেই রকম একটা principle থাকাই সম্ভব। সুতরাং যখন সবাই কাউকে স্বার্থপর বলে ঈর্ষা করছে ও আর কাউকে নিঃস্বার্থপর বলে বাহবা দিচ্ছে, তখন আমার চিরদিন কৌতূহল রয়েছে, এমন একটা কিছু বের করা—যা দিয়ে ঐ দুজনকেই ব্যাখ্যা করা যায়, যাতে করে দু'জনকে ব্যাখ্যা করতে দু'টো principle-এর দরকার হয় না। সেই

কৌতূহলের ফলে আমি অশেষ গবেষণার পর বিশেষ আবিষ্কার করেছি যে, স্বার্থপরতাটাই আসল জিনিস, নিঃস্বার্থপরতাটা একটা বাজে কথা, ওটা হচ্ছে ethical world-এর একটা নৈতিক বক্তৃতা—যা চোখ বুঁজে করা হয় ও মুখ বুঁজে শোনা হয়।

এত বড় একটা সাংঘাতিক কথা আমি বললুম আর তুমি অমনি তা গলাধঃকরণ করবে সে আশঙ্কা আমার নেই, সে আশঙ্কা নেই বলেই এমন একটা কথা তোমায় বলতে ভরসা পেলুম। কিন্তু ব্যস্ত হোয়ো না—এর লম্বা ব্যাখ্যাও আমি দাখিল করব। তারপর আমার বিশ্বাস তুমি দেখবে আমার এই কথা একেবারে pure truth, অর্থাৎ—নির্জ্জলা সত্য। আর ঐ সত্যটি যে তেমন সাংঘাতিক নয়, তারও আমি প্রমাণ দেব।

প্রথমেই আমি তোমাকে একটা অতি সোজা কথা ও অতি স্পষ্ট কথা বলছি। আমরা যে কাউকে স্বার্থপর ও কাউকে নিঃস্বার্থপর বলি তার কারণ, আমরা স্বার্থ জিনিসটার একটা অতি সংকীর্ণ অর্থ দিয়ে বসেছি। এই সংকীর্ণ অর্থ দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের চর্ম্মচোখে স্পষ্ট দেখার প্রতিফল।

চর্ম্মচোখে স্পষ্ট দেখার একটা মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে, যেটা মানুষের চোখে পড়ে সেইটেকেই সে বাড়িয়ে তোলে—সেইটেকেই সে একটা অযথা বড় মূল্য দিয়ে বসে।

তাই, যে মানুষটা আপনার জন্য কোঠাবাড়ী বানাচ্ছে আর যে মানুষটি পরের জন্যে কুটীর তৈরি করে দিচ্ছে এদের একজনকে স্বার্থপর মনে করে সেলাম করে চলি আর একজনকে নিঃস্বার্থপর মনে করে পিঠ চাপড়ে বলি, "বহুৎ খুব"; কিন্তু ঐ দুজনার পৃথক কর্ম্ম

motive-এর অন্তরালে রয়েছে কিন্তু একটা জিনিস। সেই জিনিসটির নাম হচ্ছে—চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা জিনিসটাকে গোড়ার বিষয় করে যদি দেখ, তবে দেখবে, ও-দুয়েরই লক্ষ্য সুখ; তবে কেউ বা দেখে দেহের সুখ, কেউ বা খোঁজে মনের সুখ। এই যা প্রভেদ। এইখানে একটা অত্যুত্তম রহস্যের কথা তোমায় বলি শোন। সাধু যে তার পক্ষে অসাধু হওয়া ঠিক ততটা দুঃখের কারণ, অসাধু যে, তার পক্ষে সাধু হওয়া যতটা। তেমনি মনের জগতে যে, তার পক্ষে দেহের জগতে এসে বাস করা ততটা অসুখের, দেহের জগতে যে, মনের জগতে গিয়ে বসে থাকা তার যতটা। সুতরাং ব্যবহারিকক্ষেত্রে যার যে মূল্যই দাও না কেন প্রত্যেকের আসল স্বার্থ হচ্ছে তার স্বধর্ম্ম। এই স্বার্থকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, কেন না স্বধর্ম্মকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। হয়ত তুমি প্রশ্ন তুলবে যে, অসাধু যে সে কি চিরকাল অসাধু থেকেই যাবে? যে যা সে কি জীবনভর জন্ম জন্মান্তরে তাই-ই থেকে যাবে?—তা নয়। কেন না ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করা চলে; কিন্তু এ পরিবর্ত্তন করতে হলে চাই সাধনা। সাধনা অর্থ—পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ।

সে যাইহোক, উপরে আমার ঐ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে বলা যে, মানুষকে দেখতে হবে তার বাইরের বস্তুজগতের দিক থেকে নয়, তার অন্তরের মনোজগতের দিক থেকে; আর সেইটেই হচ্ছে সত্যিকারের দেখা। মানুষকে যারা বাইরের বস্তু দিয়ে পরিমাপ করতে চায় তারা হচ্ছে জড়বাদী। কিন্তু যখন মানুষকে তার সত্যিকারের দিকথেকে দেখবে, অর্থাৎ—তার মনোজগতের দিক থেকে দেখবে, তখন দেখতে পাবে যে, ও—রাম রাবণের কীর্ত্তিকলাপের পিছনে

একই principle, অর্থাৎ—একই ধর্ম্ম, আর সেটা হচ্ছে তাদের স্বধর্ম্ম। অবশ্য তুমি অযোধ্যায় বসে গভীর প্রাণের নিবিড় আবেগে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে পার কিন্তু একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমারই মত আর কেউ লঙ্কায় বসে রাবণসম্বন্ধে ঐ একই কথা একই সুরে ভাঁজতে পার। জেনারেল ডায়ার সম্বন্ধে কি হচ্ছে তা ত জানই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মনের তৃপ্তি। তবে মনের এ তৃপ্তি কেউ পায় দশ হাজার টাকা কুড়িয়ে, কেউ ছড়িয়ে বা কেউ উড়িয়ে—এই যা প্রভেদ। এ প্রভেদ "ইতরে জনার" দিক থেকে খুবই বড় প্রভেদ সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার দিক থেকে ও-তিনের একই উদ্দেশ্য, সে হচ্ছে বৈঠকখানায় হাল্‌কাভাবে যদি বলতে হয় ত তবে বলি খেয়ালের চরিতার্থতা, আর তর্কসভায় গম্ভীর ভাষায় যদি বলতে হয় ত বলি স্বধর্ম্মের উদ্‌যাপন।

উপরে লক্ষ্য করবে আমি কখনো আত্মা কথাটার উল্লেখ করি নি। আমার দৌড় মন পর্য্যন্ত, মনোজগত পর্য্যন্ত। এই মনকেই বা মনোজগতকে তুমি টেনে বাড়িয়ে আত্মাতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পার, যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তবে আমি যে এতক্ষণ আত্মা কথাটাকে বাদ দিয়ে কথা বলেছি তার কারণ, ও-বস্তুটি আমার কাছে চিরদিনই গোলমেলে। ও-জিনিসটি আমার কাছে মনে হয় জ্যামিতির বিন্দুর মত। বিন্দু, অর্থাৎ—which has position but no magnitude, অর্থাৎ—যার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নেই, অর্থাৎ—আত্মা হচ্ছে অপরিমেয়। যে বস্তু অপরিমেয় সে বস্তুকে পাঁচ লাইনে দশবার করে উল্লেখ করতে আমার মন সরে না। বিশেষত উল্লেখ করলে আমার কেবলই মনে হত যে, আমি তোমাকে ধমক দিয়ে ঠিক রাখছি।

সে যাই হোক, মানুষকে তার এই অন্তরের দিক থেকে দেখতে চাই নে বলে আমরা স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ এই দুটো কথার মধ্যে একটা আসমান জমিন গরমিল গড়ে তুলেছি। আমাদের এই জড় বুদ্ধিই এই বস্তু-জগতের উপরে মানুষের সকল সুখের উপাদান চাপিয়ে দিয়েছে। তাই সেই বস্তুজগতকে যখন কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে তখনই আমরা মনে করে বসি যে, সে জীবনে সব সুখকেই পরিহার করেছে। আমরা তখন মোটেই মনে করতে পারি নে যে, দেহের বিলাসের চাইতে মনের বিলাস বড়। এবং যখনই যে দেহের বিলাস স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে তখনই জানবে যে সে মনের বিলাসের সন্ধান পেয়েছে বা সেই ফিকিরে আছে। তবে মনোজগতের স্বার্থকতার জন্যে মানুষ বস্তুজগতের অনেক দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যারা বস্তু আহরণ করে তাদেরই কি কম কষ্ট স্বীকার করতে দেখা গিয়েছে? অর্থের জন্য আত্মা বিক্রয় ত জগতে বিরল নয়। অর্থের জন্য আত্মা বিক্রয় করে' যদি মানুষ সুখ পায় তবে আইডিয়ার জন্য দেহের বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল দুঃখই পাবে এ-কথা দু'শতাব্দী আগেকার ইউরোপও বলবে না। বস্তুর নেশার চাইতে আইডিয়ার নেশা অনেক গুণ বড়। কেননা বস্তুর নেশা স্পর্শ করে' দেহকে, বড় জোর স্নায়ুমণ্ডলকে কিন্তু আইডিয়ার নেশা স্পর্শ করে মনকে আত্মাকে। সুতরাং বস্তুতে আছে দেহের সুখ, বড় জোর প্রাণের সুখ আর আইডিয়াতে আছে মনের সুখ আত্মার সুখ। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে' মান তবে এ-কথা ত তোমাকে মানতেই হবে যে, দেহের সুখের দিকে না তাকিয়ে যাঁরা মনের সুখের সন্ধানে ফিরছেন তাঁরাই বড় স্বার্থপর। আসল ভক্তও তাঁকেই বলি যিনি

বলতে পারেন, "কৃষ্ণধনে যেই ভজে সে বড় চতুর।" কৃষ্ণধন ভজা ভক্তের কাছে যতদিন এমনি স্বার্থের আকারে না দেখা দিয়েছে ততদিন তার সিদ্ধি নেই। তা শুধু কৃষ্ণভজাই বা কেন, দেশ-সেবা লোক-সেবা বা আর যে-কোন সেবাই হোক।

ভাল কথা, দেশ-সেবার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। যখন স্বদেশী রমরমারম্ চলছিল তখন যখন শুনতুম যে, অমুকে কলমের এক আঁচড়ে হাজার টাকা মাইনের চাকুরী ছেড়ে দিলে দেশের কাজ করবার জন্য আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন শুনতুম কত লোকের উচ্ছ্বসিত প্রকম্পিত বিকম্পিত কণ্ঠের বাহবা ধ্বনি—ওঃ কি স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন আমার মনে হ'ত লোকগুলো কি Vulgar! যেন এরা কাম কাঞ্চনকেই জীবনের সার করে' বসে' আছে। যেন কাম কাঞ্চনের চাইতে মানুষের আর কোন বড় সুখের উপাদান নেই। এই যে মানুষের দেহকে বাড়িয়ে তোলা এর মধ্যে আছে একটা বিরাট অজ্ঞানতা। আর মানুষের এই দেহের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় চোখ রেখেই স্বার্থের সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সব মানুষই ত দেহাত্মবুদ্ধি নয়। যাঁরা অন্তরের জগতে আপনাকে টেনে তুলেছেন তাঁরা জীবনে সেই অন্তরের জগতের সূক্ষ্মতর সুখেরই আয়োজন করে' চলেছেন। এই দিক থেকে যখন ব্যাপারটা দেখবে তখন স্পষ্ট বুঝবে যে কেবল এক স্বার্থই আছে আর কিছু নেই।

যখনই দেখবে কোন মানুষ স্বেচ্ছায় বস্তুকে ত্যাগ করেছে তখনই জানবে যে, সে বিষয়কে বড় করে' পেয়েছে, অর্থাৎ—সে দেহের চাইতে মনকে বড় করে' প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেহের ভোগই ভোগ,

মনের ভোগ ভোগ নয়; দেহের সুখই সুখ, মনের সুখ সুখ নয় এ কথা আজ এই বিংশ শতাব্দীতে গরু গাধাও মনে করবে না। তবে দৈহিক ভোগ আর মানসিক ভোগে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে। এক জনের দেহের সুখ আর এক জনের দেহে সংক্রামিত করে' দেওয়া যায় না, কিন্তু মন জিনিষটা সূক্ষ্ম বলে' এক দেহের সঙ্গে অন্য দেহের সম্বন্ধের চাইতে এক মনের সঙ্গে অন্য মনের সম্বন্ধ সহজ আর সেই জন্যে এক মনের সুখ অন্য মনে অতি সহজে চারিয়ে দেওয়া যায়।

আমার উপরের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনে তা সাংঘাতিক বলে' ঠিক করে' বসে থেক না। আমার ওই কথা প্রচার করলেই যে অমনি সবাই দেহাত্মবাদী হ'য়ে উঠবে এ কথা কস্মিন কালেও মনে করো না। আসলে ও-কথা যদি মনে কর তবে তার মানেই হবে এই যে, তোমার মতে মানুষ দেহের জগতকে বর্জ্জন করে কেবল নিঃস্বার্থ-পরতারূপ বাহবা লাভ করবার জন্যে। সুতরাং সেই "নিঃস্বার্থপর"-রূপ প্রশংশার অভাবে সবাই দেহকেই সার করে' বসে' থাকবে। কিন্তু তা নয়। এ কথা কোন দিনও মনে করো না যে, এ জগতে কতগুলো বোকা লোক চাটু বাক্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাদের দৈহিক আরাম সুখ সুবিধা ত্যাগ করেছে। মানুষের দেহকে প্রাণকে ডিঙিয়ে উপরের জগতের উঠার মধ্যে কোনরকম ঠকামো নেই। নীতিবিদেরা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে গোঁফে তা দিতে দিতে মনে করতে পারেন যে, বিশ্বমানব তাঁদের নৈতিক বক্তৃতার চোটেই মাথাটা কোনরকম ঠিক রেখে চলেছে। কিন্তু আসলে তা নয়। দধীচি মুনিই হোক আর নফর কুণ্ডুই হোক এরা কেউ-ই নীতিগ্রন্থের পাতা থেকে নেমে আসেন নি তা আমি

তোমাকে হলপ করে বলতে পারি। মনে কর যদি কোন মিশনরী মহিলা গ্রিয়ার পার্কে তাঁর চিম্‌টি-কাটা চশমাজোড়া নাকের ডগায় গুঁজে নিম্নলিখিত ষ্টাইলে বক্তৃতা সুরু করে দেন ঃ—

"হে জননীবৃণ্ড, আপনাডিগকে আজ আমি বলি যে, আপনারা আপনাডের সণ্টানডিগকে ষ্টন ডান করিবেন, পুট্টকন্যাগণকে আপনি আহার না করিয়া পুষ্ট করিবেন তবে প্রভু যিশু আপনাডিগকে প্রেম করিবেন, আপনাডের স্বর্গের পঠ সুগম হইবে।"

এবং বাড়ী গিয়ে ভাবেন যে তাঁর বক্তৃতার চোটেই সব "জননী-বৃণ্ড" "স্বর্গের পঠ সুগম" করবার জন্যই সন্তান লালন পালন করছেন তবে সেটা কেমন হাস্যাস্পদ হয় বল দেখি? নিজে না খেয়ে সন্তা-নকে খাওয়ানোর মধ্যে মায়ের যে কত বড় সুখ আছে, সে সুখ সমস্ত নীতিগ্রন্থগুলোকে ভস্ম করে' কীর্ত্তিনাশার জলে ভাসিয়ে দিলেও লোপ পাবে না—যে সুখের আনন্দ সমস্ত নীতিবিদ্‌মণ্ডলীর চাইতে অমর অক্ষয়। এই আনন্দের লোপ হ'লে লক্ষ কোটী নীতি-বিশা-রদেরা মিলেও এই জগতকে রক্ষা করতে পারবে না।

এখানে আমি মা ও সন্তানের উদাহরণ দিয়েছি, কারণ ও-ব্যাপারটা আমাদের কাছে এম্‌নি স্পষ্ট যে ও-সম্বন্ধে আর কেউ তর্কই তুলতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক ত্যাগের পিছনে তোমরা যাকে নিঃস্বার্থপরতা বল তার পিছনে ঠিক অম্‌নি একটা প্রক্রিয়া আছে—অম্‌নি একটা লাভ আছে। যে লাভ হচ্ছে একটা বৃহত্তর আনন্দ। সুতরাং মানুষ তার দেহের জগত থেকে মনের জগতে উঠবেই—পরের খাতিরে নয়, নিজের গরজেই। কারণ সেইটেই তার বড় স্বার্থ।

এইখানে তুমি নিশ্চয় একটা প্রশ্ন করবে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই

যে, ত্যাগই যদি বড় স্বার্থ হয়, দেহের জগত থেকে মনের জগতে ওঠাই যদি বৃহত্তর আনন্দ হয় তবে জগতের অধিকাংশ লোকই আপন আপন গণ্ডীতে সংকীর্ণ হ'য়ে আছে কেন—ওই সূত্র অনুসারে ত সবারই বুদ্ধ বা চৈতন্য হয়ে ওঠা উচিত ছিল, ও-পথ যদি অমনি আনন্দদায়ক হয় ?—তার উত্তর সোজা, এর উত্তরে আমি তোমায় প্রশ্ন করব যে, ভোগ অর্থই যদি সবার চাইতে বড় সুখ হয় তবে জগতের সবাই লক্ষপতি হয়ে ওঠে না কেন ? এর উত্তরে তোমাকে বলতে হবে যে, কি করে' লক্ষপতি হ'তে হয় তা সবার জানা নেই, জানা থাকলেও তা অনেকের করবার সামর্থ্য নেই, অর্থাৎ—তাদের অজ্ঞানতা ও শক্তির অভাব। তোমার প্রশ্নের উত্তরও ঠিক তাই। অজ্ঞানতা ও শক্তির অভাব। অধিকাংশ লোক এটা অনুভবই পান না যে দেহের বিনাশের চাইতে মনের বিনাশ বড়। অনেকে অনুভব পেলেও সেখানকার জগতে ওঠার মত শক্তি পায় না। আমি তোমার কাছে সংস্কৃত বচন আওড়াব না, নইলে তোমায় শুনিয়ে দিতুম—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—শক্তিহীনের অমৃতে অধিকার নেই—এ কথা অতি সত্য অতি সত্য অতি সত্য।

সে যাই হোক, মানুষকে যখন তার দেহের দিক থেকে, তার পশুত্বের দিক থেকে না দেখে তার বড় দিক থেকে তার পরিপূর্ণ রহস্যের দিক থেকে দেখবে তখন স্পষ্ট বুঝবে যে, ত্যাগ বলে' বিশ্বমানবেরই হোক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হোক কোন আইডিয়াই নেই। কেননা যেখানে যে-কেউ স্ব-ইচ্ছায় কোন কিছু ত্যাগ করেছে সেখানেই জানবে যে সেই ত্যাগের পিছনে সে একটা কিছু, যা ত্যাগ করেছে তার চাইতে বড় লাভের সন্ধান পেয়েছে। আর কোন কোন স্থলে

তোমার আমার মতে সেই "বড় লাভ" আসলে বড় লাভ হ'তে পারে কিন্তু সে লাভের হিসেব আছে নিশ্চয়ই। মানুষ শূন্যের জন্যে কোন দিন হাতের পাঁচ ছাড়ে না, যদি ছাড়ে তবে বুঝবে যে সেই শূন্যকে সে হাতের পাঁচের চাইতে বড় বলে' বসে' আছে। এই দিক থেকে দেখলে দেখবে যে, ত্যাগ বলে' কোন বস্তু নেই ; সুতরাং নিঃস্বার্থপরতা বলে কোন আত্মিক অবস্থা নেই।

ও-সম্বন্ধে যে আমি তোমাকে আরও পাঁচ সাত পাতা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে না পারতুম তা নয়। কিন্তু এইখানেই থামলুম। কেননা তোমার অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার যে দুটি জবাব তার ঐ প্রথম জবাবটিই আমার প্রথম জবাব নয়। আমার আসল জবাব হচ্ছে দ্বিতীয়টি। সুতরাং ওটার পিছনে ওইখানেই দাঁড়ি টেনে দ্বিতীয় জবাবটি তোমার কাছে দাখিল করছি।

আমার দ্বিতীয় জবাবটি হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে আমায় ঊষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার সন্ধ্যা থেকে ঊষা পর্য্যন্ত 'কায়েনমনসা বাচা' ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছি সে কেবল আমার দু' চোখের পুরো দৃষ্টি তোমারই পূর্ণ স্বার্থের উপরে রেখে। আমাকে ভালবাসা তোমারই স্বার্থ। কেননা ভালবাসতে পারার চাইতে বড় সুখ বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। সুতরাং তার চাইতে বড় স্বার্থও মানুষের আর কিছুতে নেই।

যে মানুষটির সঙ্গে তোমাকে সারা জীবন ধরে' বাস করতে হবে তার সঙ্গে যদি তোমার একটা অবহেলার সম্বন্ধ হয়—কিম্বা অবহেলার না হলেও কেবল সবার সঙ্গে যেমন সেই রকম একটা সহজ সাধারণ আটপৌরে সম্বন্ধ হয়, তবে তোমার জীবনটি কি ভীষণ একটা

drudgery হ'য়ে উঠবে বল দেখি? মনে করতেও আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। অপর পক্ষে যে মানুষটির কাছে তুমি থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার পাঁচটি মিনিটও হয়ত যাকে এড়িয়ে চলতে পারবে না, যে-মানুষটি, আমি নিশ্চয় করে' বলতে পারি, তোমার কাছে একটা প্রকাণ্ড দাবী নিয়ে হাজির হবে, সেই মানুষটিকে যদি তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পার তবে তোমার জীবনটি কি মধুময়ই না হয়ে উঠবে মনে কর দেখি? সে ভালবাসা যত নিবিড় যত গভীর হবে, জীবনের আনন্দও তত নিবিড় তত গভীর হবে। কল্পনা কর দুটি অবস্থা। আমার সান্নিধ্যে তোমার দেহের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, আমার একটি কথায় তোমার সারা মন বিরক্তিতে ভরে' উঠবে—সে কি ভীষণ। এর চাইতে বড় শাস্তি তোমার আর কি আছে? কিন্তু আবার দেখ অন্য অবস্থা। কল্পনা কর আমার একটি দৃষ্টি-সম্পাতে তোমার গণ্ডে গ্রীবায় গোলাপে গোলাপময় হ'য়ে যাবে, আমার একটুকু স্পর্শের আভাসে সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র বিদ্যুৎ চারিয়ে যাবে—একটুকু আদরে মনে হবে—কি মনে হবে?—হয়ত মনে হবে তোমার সমস্ত মন প্রাণ যেন কোন্ এক অতি সুখের মৃত্যু দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে দূর থেকে দূরে আরও দূরে আরও দূরে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম হ'য়ে আরও সূক্ষ্ম—আরও সূক্ষ্ম—যেন কি একটা পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে একটা পরম শান্তির মধ্যে তন্দ্রার আবেশের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। মিনি, স্বর্গে কি এর চাইতে বেশি আর কিছু আছে? বিশ্বাস না হয়, যখন সেখানে যাবে নোট্ মিলিয়ে দেখো। কিন্তু এই মর্ত্ত্যে ঐ স্বর্গের সন্ধান পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটা নিবিড় গভীর বিরাট প্রেমের অনুভূতি—মধুর প্রেমের অনুভূতি।

সুতরাং এই সব নানান্ দিক দেখে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাকে ভালবাসা তোমার নিজেরই স্বার্থ—প্রকাণ্ড স্বার্থ—চরম স্বার্থ।

বিশেষত ভগবান যাকে যে-বস্তু দিয়েছেন তার পক্ষে সে বস্তুর চর্চ্চা না করা মহা পাপ! ভগবান নারী জাতিকে বিশেষ করে' দিয়েছেন হৃদয়; যেমন পুরুষ জাতিকে বিশেষ করে' দিয়েছেন মস্তিষ্ক। সুতরাং নারীজাতির পক্ষে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করা কেবল যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাই নয় আমার মনে হয় ঐ পথেই তাদের সত্যও লাভ হবে।

একাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা ছিল পুরুষের সভ্যতা। সে সভ্যতার মধ্যে নারী-জীবনের বা নারী-আত্মার কোন ছাপ ছিল না, যা ছিল সেটা নিতান্তই হসন্ত রকমের। ঐ যে মানুষের সভ্যতায় নারী এতকাল পর্য্যন্ত কোন ঠাঁই পায় নি, হয় ত তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুরুষের মস্তিষ্কের অনুশীলনের জন্যে একটা বাধা বিপত্তিহীন মুক্ত পথ উন্মুক্ত রাখা। মস্তিষ্ক জিনিষটাই হচ্ছে নির্ম্মম; সুতরাং সেখান থেকে নারীকে দূরে রাখতেই হয়েছিল, নইলে হয়ত তারা পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু আজ চারিদিক দেখে শুনে বার বার যে কথাটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে, পুরুষের মস্তিষ্কের জন্যে যে সময় ধার্য্য ছিল তা শেষ হয়েছে। এইবার মানুষের যে সভ্যতার পত্তন হবে তা পুরুষের এক হাতে গড়বে না।—তা গড়বে পুরুষ নারীর দু' হাতে। আজ জগতের সভ্যতায় মস্তিষ্কের একটুকুও কোনখানে কম্‌তি নেই, কম্‌তি আছে হৃদয়ের। নারীকে সেখানে সেই হৃদয়ের জোগান দিতে হবে।

আসলে নারীকে যে বিশ্ব-সভ্যতা গড়বার ভার হাতে নিতে হবে, সেই ভার হাতে নিয়ে যদি নারী পুরুষেরই কেবল একটা দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আবির্ভূতা হন, তবে এ নূতন পুরোহিতের আবির্ভাবে যে মানুষের বৃহত্তর দিক থেকে কোন লাভ লোকসান হবে তা মনে হয় না। কিন্তু সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয় বলেই আমার বিশ্বাস এবং বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটি চালও অর্থপূর্ণ বলেই আমি মনে করি। সুতরাং নারীকে আসতে হবে নিশ্চয়ই পুরুষের একটা নিকৃষ্ট সংস্করণরূপে নয়—আসতে হবে তাকে আপনার স্বতন্ত্র সত্ত্বা পৃথক ঐশ্বর্য্য নিয়ে, একটা কিছু নতুন সম্ভার নিয়ে, যে সম্ভার নারীরই বিশেষ আপনার। কাজেই যে সম্ভার নারীই বিশেষ করে' পরিপূর্ণ করে' দিতে পারে, সেটি হচ্ছে নারী-আত্মা, নারীর হৃদয়।

তবে আজ যে আমরা পাশ্চাত্যে নারীর পৌরুষভাব লক্ষ্য করছি, তার কারণ পুরুষের গড়া-সভ্যতার মাঝে তাকে আজ আপনার স্থান পুরুষের শত সহস্র বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে করে' নিতে হচ্ছে। সুতরাং আজ নারীকে সেখানে বাধ্য হ'য়ে পুরুষেরই গড়া-বর্ম্ম পরতে হয়েছে ও চর্ম্ম ধরতে হয়েছে। কিন্তু নারীর যদি পৃথক সত্ত্বা থাকে, সময়ের চাইতে সত্য যদি বড় হয় তবে নারীর একদিন প্রকাশ হবেই হবে, পুরুষের একটা অপৌরুষ সংস্করণরূপে নয়, একদিন প্রকাশ হবে নারী আপনার আত্মার আপনার অন্তঃপ্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্যে, আপনার মহিমাময়ী মূর্ত্তি নিয়ে।

এবং আমার মনে হয় যে, বিশ্বমানবের সভ্যতায় পুরুষের মস্তিষ্ক যে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে নি, নারীর হৃদয়ের আলোকে সেই সমস্যাগুলোর নিরাকরণ পরিষ্কাররূপে সহজ হ'য়ে উঠবে, নারীর

সহজ অন্তঃপ্রেরণা সে সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ অতি সহজে খুঁজে পাবে। একমাত্র অন্তরের সম্পদে যে সম্পদশালী সেই বাইরের সম্পদ ত্যাগ করতে পারে। নারীর অন্তর বিশ্বমানবের সভ্যতার এক নূতন ভিত্তির রচনা করবে। সে ভিত্তি বস্তুজগতে নয়, অন্তর জগতে।

সুতরাং নারীর আপনার দিক থেকেই হোক বা বিশ্বের দিক থেকেই হোক—নারী-জাতির হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন করা অত্যন্ত লাভের।

কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষনে ভীষণ বিরক্ত হ'য়ে উঠেছ। নিশ্চয় তুমি মনে মনে ভাবছ যে, আমার এই প্রকাণ্ড যা'-তা' বক্তৃতা কোন একাডেমীর সামনে করা উচিত ছিল। এ বক্তৃতার ভার তোমার উপরে চাপাই কেন?

কিন্তু দুঃখু কোরো না। এর পরের বার যে পত্র লিখব তাতে একেবারে "প্রিয়তমে" থেকে আরম্ভ করে' "একান্ত তোমারই" পর্য্যন্ত কেবল থাকবে তোমারই রূপ বর্ণনা আর গুণ অর্চ্চনা। আর তাতে থাকবে—

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি
সখি জাগো সখি জাগো
মেলি' রাগ অলস আঁখি
সখি জাগো সখি জাগো।"

এমন কি যদি তেমন inspiration পাই, তবে বসন্তর সঙ্গে প্রাণকান্তর মিল লাগিয়ে একটা মৌলিক কবিতাও রচনা করে' পাঠাতে পারি।

ইতিমধ্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন প্রতিসন্ধ্যায় পূবগগনে প্রথম তারাটি উঠার সঙ্গে আমারি বিরহে তোমার হৃদয়-তল ব্যথিত হ'য়ে ওঠে, তোমার কালো উজল চোখ দুটো সজল হ'য়ে আসে—আর চাপা দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বুকটি ভরে যায়। ইতি

তোমার
স্বামী

গত কংগ্রেস

—:০:—

(ভূমিকা)

ভাদ্র মাসের অকাল কংগ্রেসে আমি "সবুজপত্র"-এর রিপোর্টার-স্বরূপে উপস্থিত ছিলুম। সে-ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নোট নিতেও বাধ্য হই, এই অভিপ্রায়ে যে, অবসর মত, সেই নোটগুলোর অন্তরে অনেকখানি পেট্রিয়টিজমের হাওয়া ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা প্রমাণসই পলিটিক্যাল প্রবন্ধ তৈরি করব। কিন্তু যে-কাজ আমি করতে চেয়েছিলুম, সে-কাজ ইতিমধ্যে এত দেশী বিলাতি, বাঙলা ইংরাজি দৈনিক পত্রে করা হয়েছে যে, মাসিক পত্রে তা আর করবার দরকার নেই। তা ছাড়া আমার বিবেচনায় গত কংগ্রেসের বিপক্ষে বিলাপ ও স্বপক্ষে প্রলাপের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছে যে, তা আর বাড়ানো যেমন অনাবশ্যক তেমনি অনর্থক। এই সব কারণে, নোটগুলি যেমন আকারে নেওয়া হয়েছিল, সেই আকারেই প্রকাশ করা শ্রেয় মনে করছি। সেগুলি অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করার একটু সার্থকতাও আছে। সে সবের আর কোন গুণ না থাক্, সে গুলি যে তাজা ও টাট্‌কা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই নোটগুলির যদি কিছু মূল্য থাকে ত সে এই কারণে যে, ও-গুলোর ভিতর যুক্তি তর্ক, দর্শন বিজ্ঞান, পলিটিক্স ও ইকনমিক্‌সের স্পর্শমাত্রও নেই। সুতরাং এ গুলি পড়ে, কোম

পাঠকের মাথা ঘুলিয়ে যাবে না, আর যদি কারও মেজাজ বিগড়ে যায় ত আমি নাচার। মনে রাখবেন, আমার সকল কথাই বাজে কথা। বাজে কথার মহাগুণ এই যে, তা কাজের নয়, আর কাজের কথার মহাদোষ এই যে, তাতে কোনও কাজ হয় না। যে দেশে কাজের কথা বাজে কথা, সে দেশে বাজে কথা কাজের কথা হলেও হতে পারে!

(কংগ্রেসের স্বরূপ)

কংগ্রেস এবার পগ্গধারী। টুপি, পাগড়ির হয় ফার্সি, নয় তুর্কি সংস্করণ, অতএব সংক্ষিপ্ত ও অপভ্রষ্ট পগ্গ। খোলা মাথা খুব কম। পেটে বিদ্যা ও মাথায় বুদ্ধি থাকলে মুখে-চোখে তা ফুটে বেরয়। চেহারায় পরিচয় যে, অধিকাংশ ঢাকা মাথার ভিতরে কিছু নেই, অপর পক্ষে অধিকাংশ খোলা মাথার ভিতরে কিছু আছে। সে কিছু, বোধ হয় মগজ। এ কংগ্রেসে খোলা মাথা হেঁট হবে। ভোটের আদিম অর্থ বাহুবল, প্রমাণ ভোট হাত তুলে করতে হয়। বাহুবলের শক্তি একের সঙ্গে অপরের যোগে, বুদ্ধিবলের শক্তি আত্মগুণে। এ কংগ্রেসে যোগ গুণের উপর জয়লাভ করবে। কলেজস্কোয়ার, বড়বাজারের কাছে মার খাবে।

(প্রথম প্রধান ঘটনা)

শ্রীমতী আনি বেসান্তের কথারম্ভ। চতুর্দ্দিকে শিবারব। মহাত্মা গান্ধীর উত্থান ও শান্তিবচন পাঠ। শ্যাম শ্যাম (shame, shame) হুকাহুয়ার তিরোভাব। একটি চিত্রের স্মৃতিপটে আবির্ভাব। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী আনি বেসান্তকে মাথায় করে দেশের লোকের

পেট্রিয়টিক নৃত্য। বোঝা গেল পলিটিসিয়ানরা পলিটিক্সের দেব-দেবীদের মাটির ঠাকুরহিসেবে পূজা করে। তিন দিন ধরে ঢাকের বাদ্যি, ধূপ দীপ পুষ্পচন্দন স্তুতি প্রণতির ছড়াছড়ি। তার পর বিসর্জ্জন। বোঝা গেল কংগ্রেস তার ধর্ম্ম বদলে ফেল্‌লে। আন্দাজ করছি, কংগ্রেসের নব-ধর্ম্ম হচ্ছে নারী-পূজার বদলে Hero-worship.

(দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা)

যা মনে করেছিলুম হলও তাই। বাঙালীর মস্তকের উপর অ-বাঙালী-কংগ্রেসের আক্রোশ আর চাপা থাকল না। বড়বাজার কর্ত্তৃক কলেজ স্কোয়ারের উপর সহসা আক্রমণ। পগ্গধারী কর্ত্তৃক "লাংঘা শিরের" উপর যষ্টিবৃষ্টি। রক্তপাত। দেখে খুশী হলুম বাঙলার যুবকদের শরীরে রক্ত আছে আর সে রক্ত লাল। কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তিদের যুবকদের প্রতি জোর গলায় আদেশ—"দাঁড়িয়ে মার খাও, হাত তুলো না, শুধু মাথা নীচু করো"। দেখা গেল, কংগ্রেসের বাঙালী-নেতা উপনেতারা সব Tolstoi-র non-resistance মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। "অহিংসা পরম-ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধ-জৈন মত, রুশিয়ার মহা-ঔপন্যাসিকের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে স্রাফাই হয়ে, "হিংসিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ" এই আকার ধারণ করেছে। কিল খেয়ে কিল চুরি করা সকলের ধাতে সয় না। নিরপরাধ বাঙালী যুবকের ফাটা-মাথার রক্ত দেখে জনৈক জাত-বাঙাল অবিবেচক বাঙালী সাহিত্যিক শাস্ত্রের ভাষায় বললেন, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি"। কংগ্রেস-ক্যাম্পে সে ঔষধের তল্লাস সুরু হল কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। সকলকে

অগত্যা passive-resistance শিরোধার্য্য করতে হল। তার পর আততায়ীদের পক্ষ হতে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে, তিনটি ভগ্নদূতের আগমন। একটি ভাটিয়া, একটি পাঞ্জাবী, একটি মাড়োয়ারী। তিন জনের মুখেই এক কথা। "হামলোক্‌কা আদ্‌মি তোমলোক্‌কো মারা ত কেয়া হুয়া? জানে দেও। আবি ত বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী সব এক হো গ্যয়া, সবকোই কানাগারেসাকে সন্তান, সব ভাই ভাই। ভাই ভাইকো শির তোড় দিয়া, ইস্‌মে কেয়া গোস্‌সাকে বাৎ হ্যয়।" এই হচ্ছে fraternity-র হিন্দি অনুবাদ! আবিষ্কার করা গেল, নব কংগ্রেসের উহ্য ও গুহ্য সূত্র হচ্ছে বাঙালীর সঙ্গে অ-বাঙালীদের Violent co-operation!

(সর্ব্ব প্রধান ঘটনা)

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক non-violent non-co-operation-এর প্রস্তাব। বক্তৃতার মানে বোঝা গেল না। মোদ্দা কথা—ছ'মাসে স্বরাজ। তার জন্য কিছু করতে হবে না। কিছু না করলেই তা পাওয়া যাবে। পলিটিক্যাল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় সকলের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হওয়া। শুনতে কথাটা বৈদান্তিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশাস্ত্রীয়। বেদান্ত-মতে কর্ম্মত্যাগের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, সেই জ্ঞানের ফল মুক্তি। এ মত ঠিক উল্টো। জ্ঞান অর্জ্জন, সহ-যোগীতা বর্জ্জনের বিরোধী। অতএব স্কুল-কলেজ পরিত্যজ্য। প্রশ্ন—কর্ম্মমার্গ জ্ঞানমার্গ দুই ত্যাগ করে, কোন্ মার্গ ধরে ছ'মাসে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌঁছব? উত্তর—non-violent non-co-operation, পলি-টিক্যাল স্ব-রাজযোগের একটি ক্রিয়া! সে ক্রিয়া হচ্ছে বালকের

চিত্তবৃত্তির ও বাদবাকী সকলের বিত্তবৃত্তির নিরোধ। এ ক্রিয়ার আশু ফল সাযুজ্য। কার সঙ্গে?—অপরাপর স্বাধীন জাতির সঙ্গে। প্রস্তাবটা খুব পরিস্কার নয়, কিন্তু মতলব বোঝা যাচ্ছে। মনে ও চরিত্রে যদি আমরা স্বাধীন হই তাহলে জীবনে নিশ্চিত স্বাধীন হব। কথা ঠিক, কিন্তু "যদি" জিনিষটা এত অনিশ্চিত যে তার উপর কোনই ভরসা নেই। তা ছাড়া মনে স্বাধীন শুধু কথার জোর এক মুহূর্ত্তে হওয়া যায় না। সে যাইহোক বিচার শোনা যাক্।

(বিচার)

কংগ্রেসে উক্ত প্রস্তাবের বিচার সুরু হল। নানা দেশের নানা জাতীয় কংগ্রেসওয়ালা সে বিচারে যোগ দিলেন। কি হল তা বোঝা গেল না, কেননা কারও কথা স্পষ্ট নয়। কারও কারও কথা আবার এতাদৃশ অস্পষ্ট যে, তাঁরা পূর্ব্বপক্ষ কি উত্তরপক্ষ বোঝে কার সাধ্য। ইনি non-co-operation-এর পক্ষে কিন্তু non-violent-এর বিপক্ষে। উনি non-violent-এর পক্ষে কিন্তু non-co-operation-এর বিপক্ষে। কেউ বা উক্ত প্রস্তাবের প্রতি দফার দফারফা করতে প্রস্তুত কিন্তু সমগ্রটি গ্রাহ্য করেন। কেউ বা আবার প্রতি দফাটি গ্রাহ্য করে সমগ্রটি প্রত্যাখ্যান করলেন। দু' এক জন প্রস্তাবটি লম্বা করবার পক্ষে, আর পাঁচ জন সেটি খাটো করবার পক্ষে। দেখা গেল, প্রস্তাবটির অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কারও মতের মিল নেই, অতএব এ বিষয়ে সকলের পক্ষে একমত হওয়ার কোনও বাধা নেই! যেখানে বুদ্ধিবলে কুলায় না, সেখানে বাহুবলে কুলায়, সুতরাং দেখা যাক ভোটে কি হয়।

(ভোট)

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট হল ৯৯৯, তার পক্ষ হল এক, অর্থাৎ—মহাত্মা গান্ধীর। তবে সেই এক ভোটেই যে প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল, তার কারণ সেই একের পিঠে ছিল অনেক গুলি 'শূন্য', সুতরাং গুণ্‌তিতে সে 'এক' অনেক হাজার হয়ে উঠল!

(উপসংহার)

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।" Non-co-operation প্রস্তাব পাশ হবার পর কংগ্রেসের সভাপতি লালা লাজপত রায় কর্ত্তৃক তার উপর অসি চালন, তৎপরে বাঙালীর পরাজয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ। তাঁর দুঃখ বাঙালী কংগ্রেসের নেতৃত্ব খোয়ালে। সত্য কথা এই, এ কংগ্রেসে বাঙালী তার নেতৃত্ব হারায় নি, তা যে তিন বৎসর আগে হারিয়েছে সেই সত্যটা প্রমাণ হল এই কংগ্রেসে। আর এক কথা, আমরা কংগ্রেসের অনুচর ও পার্শ্বচরের দল, (এবং দলে আমরাই পুরু, নেতারা নন) প্রস্তাবটি শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছি। কি কারণ?—তার উত্তরে আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উক্ত প্রস্তাবের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য ত দূরের কথা, তার অর্থ সামর্থ্য কিছুই ধরা পড়ল না। ইংরাজি ভাষায় ও-চতুষ্পদ সমাসটির কোনই অর্থ হয় না। অর্থহীন পদের পূর্ব্বে "না" বসিয়ে দিলে তা অর্থপূর্ণ হয় না। আমাদের পলিটিক্সে co-operation-এর কোনও অর্থ নেই, অতএব non-co-operation-এরও কোনো অর্থ নেই। মিছে কথার উল্টো কথা সত্য কথা নয়, মডারেটদের বাজে কথার প্রতিবাদ, কাজের কথা নয়।

তার পর কংগ্রেসের প্রস্তাবে আর যাই থাক, non-co-operation নেই, অর্থাৎ—তার নাম আছে বটে, কিন্তু রূপ নেই। এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রস্তাব নিয়ে তর্ক ছাড়া আর কিছু করা যেতে পারে না এবং সে তর্ক কিছুদিন ধরে ভারত জুড়ে হবে। পঞ্জাবের অত্যহিত অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করবার জন্য যে কংগ্রেস আহুত হয়েছিল, সে কংগ্রেস যে শুধু একটি তর্কের প্রতিষ্ঠা করে গেল, এর চাইতে অদ্ভুত আর কি হতে পারে। যে কথায় শুধু কথা বাড়ে, সে কথায় কাজ কমে কি?

কংগ্রেস যদি বুরোক্রাসির সঙ্গে সহযোগীতা বর্জ্জনের প্রস্তাব না করে, বুরোক্রাসির প্রতিযোগীতা অর্জ্জনের সংকল্প করতেন, তাহলে বোধ হয় বাঙালী তার নেতৃত্ব ফিরে পেলেও পেতে পারত। প্রতিযোগীতা অর্জ্জন কর্ম্মক্ষেত্রে সাধনা সাপেক্ষ, আর বাঙালী গত পোনেরো বৎসরে ঠেকে শিখেছে যে, কোনো মন্ত্রে সিদ্ধ হতে হলে ক্রিয়া চাই। এক বচনসার পলিটিসিয়ান ছাড়া বাঙলার আর কেউ নিষ্ক্রিয় হবার মাহাত্ম্য প্রচার করতে প্রস্তুত হবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাবের অন্তরে আছে শুধু নিষেধ, নেই কোন বিধি। আর বিধিই মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, নিষেধ নয়। সমাজে "না"র শাসনে বাস করেই আমাদের এই দুর্গতি। জাতীয়-জীবন গড়ে তোলবার জন্য এখন যার বিশেষ প্রয়োজন সে হচ্ছে "হাঁ"। Don't নয়, Do-ই হচ্ছে নব জীবনের একমাত্র বাণী। কেননা, "Don't" শাসনকর্ত্তার আদেশ ও "Do" মুক্তিদাতার উপদেশ।

আমার এ মত শুনে যদি কেউ ব্যাজার হন, তাঁর কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অঙ্গীকার

করবার পক্ষে আমার কোনরূপ বাধা নেই। উপাধি ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত, কেন না আমার কোনরূপ উপাধি নেই। Leveé আমি এ যাবৎ শুধু ছাপার হরপেই দেখেছি এবং বস্তুগত্যা দেখবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা আমার পায়ে সয় না, রাত্রি জাগরণ আমার ধাতে সয় না, আর বেশি মাথা নীচু করলে আমার পিঠে ব্যথা হয়। ছেলেদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে আমি সদাই প্রস্তুত, কেন না আমি নিঃসন্তান। ওকালতি ছাড়তে আমার কোনও আপত্তি নেই, কেন না ওকালতি আমি করি নে। মেসোপোটামিয়াতে কুলিগিরি ও কেরাণীগিরি করতে যাবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নেই, অতএব সে অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে আমি সদাই প্রস্তুত। বিদেশী মাল আমি অবশ্য আর পাঁচজনের মত কিনি, কিন্তু সে হচ্ছে বেশির ভাগ—বই। কংগ্রেস স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেও, বইয়ের বিরুদ্ধেও যে করেছেন, এ কথা কোথায়ও স্পষ্ট করে লেখা নেই। তা ছাড়া এ দফাটা মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রস্তাবের অন্তরে লুকিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমি বহুকাল থেকে উক্ত প্রস্তাব অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছি। তার পর সত্য কথা বলতে গেলে, এ যাত্রা কংগ্রেস আমার একটু উপকার করে গিয়েছে। আমার হিতৈষী বন্ধুবর্গ আমাকে লেখার রাজ্য থেকে টেনে বার করে, বক্তৃতার রাজ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে আমাকে ইলেকসানের ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছিলেন। উক্ত প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে আমি সরে পড়েছি। কেন জানেন?—সেখানে গেলে 'পররুচি' কথা কইতে হত। সে বড় কষ্টসাধ্য। আর 'আপ্‌রুচি' কথা কইলে আমার

উপর কেউ রাজি হতেন না। কি বুরোক্রাসি, কি ন্যাসানালিষ্ট, কি মডারেট, কি খালিফেট—সবাই সেখানে আমাকে একঘরে করে দিতেন। আর একঘরে যদি হতেই হয়, ত সে নিজের ঘরে হওয়াই শ্রেয়।

আমি যে কংগ্রেসের প্রস্তাবের নীচে চেরাসই করতে প্রস্তুত নই, তার প্রথম কারণ, আমি যা বুঝি নে, তা বুঝি বলার অভ্যাস আমার নেই। আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি চাইনে যে, দেশসুদ্ধ লোক আমার মত নিষ্কর্ম্মা হোক। সবাই যদি বীরবল হয় ত দেশ আজ যা আছে কাল তার চাইতে বেশি লক্ষ্মী ছাড়া হবে। তার চাইতে সকলের পক্ষে 'বল' বাদ দিয়ে 'বীর' হওয়া শতগুণে শ্রেয়।

বীরবল